তাগুত

(প্রথম খন্ড)

যে সব লেখকের লেখনী থেকে সংগৃহীত

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী, হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসীর, ইমাম কুরতবী, ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ইবনে হাম্বল,ইমাম মালেক, হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম, সৈয়দ কতুব, শেখ মুহাম্মদ আলী আল রিফাই আল হাশমী আল কুরাইশী, শেখ আবু ওমর আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আল আবদুর করীম, সৈয়দ কুতুব, মুহাম্মদ আবদুর রহীম, খন্দকার আবুল খায়ের, শেখ মুহাম্মদ জাহিদ ফাহিম (জুনায়েদ) ।

সংকলন ও সম্পাদনায়

আবু মুসয়াব

সিরাতুল মুস্তাকিম পাবলিকেশন

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা

বিষয় পৃষ্ঠা

ভূমিকা----------৩
আকীদা পরিবর্তনের চক্রান্ত----------৬
শরীয়ী অর্থ বুঝার উপায়----------৭
ইসলাম----------৭
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার আদেশ----------৯
বর্তমান যুগে ইসলাম যেভাবে অনুশীলন করা হয়----------১১
আলাহ্‌র নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম----------১২
মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য----------১৬
মুসলিমদের কেন এ পরিণতি----------২২
মুসলিম কাকে বলে----------২৫
মুসলিমের বৈশিষ্ট্য----------২৬
সাহাবারা (রাঃ) কিভাবে মুসলিম হয়ে ছিলেন----------২৭
ইবাদত----------২৯
ইবাদতের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি বিষয়----------৩২
আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষ যাদের ইবাদত করে----------৩৭
আল্লাহর হুকুম পালন করা দরকার কেন----------৪১
ইবাদত কিভাবে করতে হবে----------৪৮
ইবাদত দলিল ভিত্তিক (কুরআন ও সুন্নাহ-র)----------৫১
কাফের ও কুফর----------৫৩
শিরক----------৬১
মুরতাদ কাকে বলে----------৬৪
তাগুত----------৬৯
মুনাফেক----------৮০
সুন্নাত----------৮৪
বিদয়াত----------৮৫
বিদয়াত কত প্রকার----------৮৮
কয়েকটি বড় বড় বিদয়াত----------৯১
ইসলামী নাম দিয়ে দল গঠন (বা ফিরকা) করা হারাম বিদয়াত---১০০
পীর মুরিদীর বিদয়াত----------১০৩
শীয়া, খারেজী, মুর্জিয়া ও মুতাযিলা ফিরকা সমূহ----------১০৯
প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতের মূল সমস্যা সমূহ----------১১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা আলাহ তায়ালার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই সাহায্য কামনা করি। তাঁরই কাছে ক্ষমা চাই। আমাদের নফ্সের সকল অনিষ্টতা এবং আমাদের সকল কর্মের ভুল ভ্রান্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁরই বান্দা এবং রাসূল।

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিবেন। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (আল-আহযাব ঃ ৭০ -৭১)

তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) এবং বর্তমান সময়ে প্রচলিত শিরকের বিভিন্নরূপের বর্ণনা সংক্রান্ত তিনটি পুস্তক (তাগুত-১ম খন্ড, ২য় খন্ড, ৩য় খন্ড) সেই সত্যানুসন্ধানকারীর সামনে উপস্থাপন করছি, যে বর্তমান সময়ে তার দ্বীন ও তাওহীদের চেতনা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। কেননা বর্তমান সময়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা যার প্রতি করুণা করেছেন, আর শিরক থেকে রক্ষা করেছেন, সে ছাড়া অধিকাংশ লোকই কোন না কোনভাবে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের (রব হিসেবে আল্লাহর যে সকল বৈশিষ্ট্য ও কাজ) ও উলুহিয়াতের (ইলাহ হিসাবে এবাদতের বা হুকুম অনুসরণের একমাত্র হকদার আল্লাহ তায়ালা) সাথে নানাভাবে শরীক করে শিরকের মাঝে লিপ্ত রয়েছে। অথচ শিরক মিশ্রিত আমল আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে গ্রহণ করা হবে না এবং শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গকে কখনই জাহান্নাম থেকে উঠানো হবে না। এরশাদ হচ্ছেঃ

বস্তুত আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও যে শরীক করেছে আলাহ্ তাহার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়াছেন। আর তাহার পরিণতি হইবে জাহান্নাম। এই সব যালেমদের কেহই সাহায্যকারী নাই।" [আল-মায়েদা ঃ ৭২]

কেয়ামতের কঠিন মুহূর্ত আসার আগেই আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূল (সাঃ) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেনঃ কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের দু'পা (স্বস্থান থেকে) এক কদমও নড়তে পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে নেয়া হবে। (১) তার জীবনকাল কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? (২) যৌবনের শক্তি সামর্থ কোন কাজে লাগিয়েছে? (৩) ধন সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে? (৪) কোথায় তা ব্যয় করেছে (৫) সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞানার্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?

আমাদের জীবনকাল কিভাবে ব্যয় করেছি এর উত্তর দেয়া ছাড়া আমরা আদালতে আখিরাতে নড়তে পারবো না সুতরাং আমাদের জীবনের প্রতিটি

সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মুহূর্ত আমরা ধাবিত হচ্ছি মৃত্যুর দিকে, কবরের দিকে। এইজন্য ওমর (রাঃ) বলতেন "আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালার কাছে হিসাবের আগে তুমি নিজের হিসাব নিজেই নাও।"

একবার ভেবে দেখুন দুনিয়াতে যদি কোন গোয়েন্দা বিভাগ বা স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক প্রতিমুহূর্তে কারও পিছনে ছায়ার মত কাগজ কলম নিয়ে অনুসরণ করতে থাকে যে, ঐ ব্যক্তির মধ্যে কি কি খারাপ বিষয় রয়েছে তাহলে সেই ব্যক্তি কতখানি তটস্থ বা উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবে যাতে তার বিরুদ্ধে কোন খারাপ রিপোর্ট লেখা না হয়। সে সব ভাল কাজ করবে ও নিজের সম্পর্কে খুব ভাল ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবে। আমাদের প্রত্যেকের সাথে কিরামান কাতেবীন নামক সম্মানিত ফেরেশতাগণ রয়েছেন। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক।

"অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ কেরামান কাতেবীন। তারা জানে তোমরা যা কর।" (ইনফিতার ঃ১০-১২)

তবে তারা দুনিয়ার স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকদের মত নয় যারা সারাক্ষণ দোষ খুঁজে বেড়ায় ও খারাপ রিপোর্ট লিখে। বরঞ্চ গুনাহ করার পর যে বান্দা অনুতপ্ত হয় ও 'আসতাগফিরুল্লাহ' (তওবা করে ফিরে আসে) পড়ে ফেরেশতাগণ সেই গুনাহ লেখেন না। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালার কতই না অনুগ্রহ আমাদের প্রতি।

ফেরেশতাগণ যে কোন কর্মের পিছনে আমাদের নিয়ত বা উদ্দেশ্যকে জানেন না। একজন আছেন যিনি আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত জানেন। বর্তমানে আমরা যা গোপন রাখতে চাই এমনকি ভবিষ্যতে আমরা যা গোপন রাখতে চাই সবই তিনি জানেন। তিনি হলেন আমাদের রব মহামহিম আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা। এজন্য আমাদের সব সময় তাকেই ভয় করা উচিৎ।

যিনি আলাহ সুবহানু ওয়া তায়ালাকে যতবেশী জানেন তিনি ততবেশী তাঁকে ভয় করেন। একদিন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও জিবরাইল (আঃ) আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা ও তার শাস্তির কথা আলোচনা করলেন তারপর দুজনে কাঁদতে থাকলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) যাঁর ঈমান সমগ্র উম্মাহর সম্মিলিত ঈমান থেকে বেশী, আল্লাহ সুবহানু ওয়া তায়ালা যার প্রতি ফেরেশতা পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- "আমি রাজী আবু বকর এর প্রতি, আবু বকর কি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।" আবু বকর (রাঃ) কাঁদতে শুরু করলেন আর বলতে লাগলেন 'আমি অবশ্যই রাজী," সেই আবু বকর (রাঃ) বলতেন "আমার ডান পা যদি বেহেশতে যায় আমি নিশ্চিত না যে আমার বাম পা বেহেশতে যাবে কি না।" ওমর (রাঃ) বলতেন "হায় আমি যদি গাছের পাতা হতাম! উট আমাকে খেয়ে ফেলতো আর বর্জ্য পদার্থে পরিণত করতো।" তিনি আল্লাহর ভয়ে এত অশ্রুপাত করতেন যে তাঁর দুইগালে কালো দাগ হয়ে গিয়েছিলো।

আল্লাহ তা'য়ালার ভালবাসা পেতে হলে তাঁর হুকুমগুলো আমাদের যথাযথভাবে পালন করতে হবে। রাসূল (সাঃ) এর পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে।

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে [মুহাম্মদ (সাঃ)-কে] অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।"

(আলে ইমরান ঃ ৩১)

আলাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দুটি গুণবাচক নাম আল হাদী (আলাহ যাকে হেদায়াত দান করেন কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারে না) এবং আল আলেম (সকল জ্ঞানের ভান্ডার তিনি)। মানুষের অবস্থা সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে ঃ

"মানুষের হিসাব গ্রহণের সময় সন্নিকটে অথচ তারা বেমালুম মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে (গাফিলতিতে)।" **(আম্বিয়া ঃ ০১)**

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষ যে গাফলতির মধ্যে পড়ে রয়েছে সে সম্পর্কে সতর্ক করছেন। এ গাফিলতি থেকে উদ্ধারের জন্যই ইলমের প্রয়োজন্ এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে (সাঃ) জানালেন এ সকল গাফিলতিতে নিমজ্জিত লোকদেরকে উপদেশ দিতে এবং স্মরণ করিয়ে দিতে। এরশাদ হচ্ছেঃ

"অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশ দাতা।" **(গাসিয়া ঃ ২১)**

"হে মুহাম্মদ (সাঃ) আপনি লোকদেরকে নসীহত করতে থাকুন, কেননা নসীহত করানো মুমিনদের উপকারে আসবে।" **(যারিয়াত ঃ ৫৫)**

"বলে দিন, এটাই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারিরা আল্লাহর দিকে বুঝে শুনে দাওয়াত দেই। আল্লাহ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অর্ন্তভূক্ত নই।" **(ইউসুফ ঃ ১০৮)**

"এমন এক সময় আসা বিচিত্র নয় যখন আজ যারা (ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে) অস্বীকার করছে, তারা অনুশোচনা করে বলবে ঃ হায়, যদি আমরা আনুগত্যের শির নত করে দিতাম। ছেড়ে দাও এদেরকে, খানাপিনা করুক, আমোদ ফূর্তি করুক এবং মিথ্যা প্রত্যাশা এদেরকে ভুলিয়ে রাখুক। শিগগির এরা জানতে পারবে। ইতিপূর্বে আমি যে জনবসতিই ধ্বংস করেছি তার জন্য একটি বিশেষ কর্ম-অবকাশ লেখা হয়ে গিয়েছিল। কোন জাতি তার নিজের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যেমন ধ্বংস হতে পারে না, তেমনি সময় এসে যাওয়ার পরে অব্যাহতিও পেতে পারে না।" (আল হিজর ঃ ২-৫)

"যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং বিদ্রোহীর ভূমিকা অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজা কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা ততোখানি অসম্ভব যতোখানি অসম্ভব সুইয়ের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ। অপরাধীদের জন্য

প্রতিফল এমন হওয়াই উচিত। তাদের জন্য আগুনের শয্যা ও চাদর নির্দিষ্ট আছে। আমরা জালেমদেরকে এরকম প্রতিফলই দিয়ে থাকি।" - **(সূরা আরাফ ঃ ৪০-৪১)**

আক্বীদা পরিবর্তনের চক্রান্ত

আপনাদের অবশ্যই জানা আছে যে, আমরা খৃস্টানদের শাসনাধীনে ছিলাম প্রায় দীর্ঘ দু'শ বছর। এই সময় ভিক্টোরিয়ান যুগের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার গ্লাডস্টোন একদিন কমন্স সভায় ঢুকেছিল একটি কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে। সে কুরআন শরীফটি উঁচু করে ধরে কমন্স সভার খৃস্টান সদস্যদের উদ্দেশ্যে করে বলেছিল– 'দেখ, এটা হচ্ছে মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন। বর্তমানে তোমরা অনেকগুলো মুসলিম দেশ দখল করে নিয়েছ। এখন তোমরা আলবেনিয়া, তুরস্ক, মিশর, ভারত, স্পেন ইত্যাদি অনেকগুলো মুসলিম দেশের উপর শাসক হয়েছ। তোমরা যদি এই সব মুসলিম দেশগুলোর উপর নিরাপদে রাজত্ব করতে চাও, তাহলে এই কুরআনের অনেক শিক্ষা থেকে মুসলমানদের দূরে রাখতে হবে। নইলে মুসলিম জাতির উপর প্রভূত্ব করতে পারবে না। তাদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিলঃ

১। আল কুরআনের সিলেবাসে যেন শুধু পরকাল সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া অন্য কিছু না থাকে।

২। আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল যেন খৃষ্টান হতে পারে। সে জন্যে তারা আইন করল ICS-এর পাশ করা লোক ছাড়া কেউ আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হতে পারবে না এবং তারা জানত যে, এ উপমাহাদেশের কোন মুসলমান ICS পাশ নেই। যার ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে আলীয়া মাদ্রাসার প্রথম ২৬জন প্রিন্সিপাল ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টান ছিল।

৩। তারা চেয়েছিল, আল কুরআনের বিশেষ বিশেষ শব্দগুলোর অর্থ বিকৃত করে মুসলমানদের ভুল বুঝাতে হবে। তারা যে সব শব্দগুলোকে বিকৃত করে বুঝাতে চেয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ইসলাম, মুসলিম, রব, ইলাহ, দ্বীন, ইবাদত, জিহাদ ও তাগুত ইত্যাদি শব্দগুলোর সঠিক অর্থ যেন মুসলমানরা জানতে না পারে এবং দ্বীন ইসলামকে যেন মুসলমানরা একটা আনুষ্ঠানিক ধর্ম মনে করে। অর্থাৎ ভারতের হিন্দুরা যেমন মনে করে, তাদের ধর্ম একটা অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম। ঠিক তেমনই মুসলমানরাও যেন তাদের দ্বীনকে ঐ রূপই মনে করে যে, নামাজ, রোজা এবং বিশেষ বিশেষ দিনে কিছু কিছু অনুষ্ঠান পালন করলেই ধর্মীয় দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে।

৪। আর তারা চেয়েছিল, তাদের আক্বীদা মুসলমানদের মগজে ঢুকাতে। খ্রিষ্টানরা ইসলাম বিরোধী এমন একটা মারাত্মক ভুল আক্বীদা মনে পোষণ করে,

যা মানুষকে জাহান্নামের পথে তুলে দিতে একমাত্র মোক্ষম হাতিয়ার। সে আক্বীদা হলো- 'মানুষের জীবনের দুটো অংশ'। যথা-

(ক) দ্বীনদারী বা ধর্মীয় অংশ এবং অপরটি হচ্ছে (খ) দুনিয়াদারী অংশ

সেই সঙ্গে তারা বিশ্বাস করে যে, আমরা দুই মহা প্রভুর অধীন। যথা-

১) আমাদের জীবনের দ্বীনদারী অংশের মহা প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ্। আর

২) জীবনের দুনিয়াদারী অংশের মহাপ্রভু হচ্ছেন রাষ্ট্র প্রধান।

এই ধারণা মুসলমানদের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই তাদের প্রয়োজন পড়েছিল ইসলাম, মুসলিম, রব, ইলাহ, দ্বীন, ইবাদত, জিহাদ ও তাগুত সম্পর্কে মুসলমানদের ভুল ধারণা দেয়ার। তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, মানুষের জীবন দুই মহা প্রভুর অধীন। এটা মুসলিমদের বুঝতে হলে উপরোক্ত শব্দগুলোর ভুল ব্যাখ্যা মুসলমানদের মন-মগজে যেভাবেই হোক ঢুকাতেই হবে। তাদের সে পরিকল্পনা তারা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে গেছে। আমরা জ্ঞানের অগোচরে তাই মেনে যাচ্ছি যা খৃস্টানদের আক্বীদা। এই আক্বীদা থেকে যদি মুসলমানরা তাদের মন-মগজকে শুধরে নিতে পারতেন, তাহলে আমরা আল্লাহ্ সুবহানু ওয়া তায়ালার রহমত আশা করতে পারতাম।

শরীয়ী অর্থ বুঝার উপায়

আরবীতে প্রতিটা শব্দেরই একটি আভিধানিক অর্থ রয়েছে। কিন্তু যখনই সেই শব্দটি আল্লাহ্ সুবহানু তায়ালা কুরআনে ব্যবহার করেছেন তখনই এর একটি শরীয়ী অর্থ চলে এসেছে। যেমন সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ দোয়া করা, কিন্তু আমরা শুধু দোয়া করে যদি মনে করি সালাত আদায় হয়ে গেছে তাহলে সালাতের শরীয়ী অর্থ হবে না। অর্থাৎ যখনই কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সালাত শব্দ ব্যবহার করেছেন তখনই সালাতের একটি শরীয়ী অর্থ চলে এসেছে অর্থাৎ সালাতের শর্ত পাক পবিত্রতা, ওযু গোসল কিবলামুখী হওয়া এবং সালাতের রোকন সূরা ফাতেহা, রুকু, সেজদা, শেষ বৈঠক, সালাম ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে ইসলাম, মুসলিম, ইবাদত, ঈমান, শাহাদাহ্, রব, ইলাহ্, তাগুত, সালাত, সাওম, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি শব্দসমূহের শরীয়ী অর্থ সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। কারণ যে কোন কাজ করার জন্য সে বিষয়ক জ্ঞান থাকা ফরজ। উদাহারণ স্বরূপ কোন নও মুসলিম যদি সালাত পড়তে চায় তাকে সালাত সম্পর্কে প্রথম জ্ঞান অর্জন করতে হবে। নিজের ইচ্ছামত উঠা বসা করলে সেটা আর সালাত হবে না ব্যয়াম হয়ে যাবে। অপরদিকে একজন ডাক্তার চিকিৎসা করার আগে চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে প্রথম বেশ কষ্ট করে হলেও জ্ঞান হাসিল করে নেয় তারপর রুগী দেখা শুরু করে ইত্যাদি।

ইসলাম

ইসলাম একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, কারো কাছে নিজেকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা। পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা দ্বীনের নাম। যা আমাদের রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ইসলাম অর্থ শান্তি এ কথা কোন নির্ভরযোগ্য অভিধানে নেই। سلام (সালাম) অর্থ শান্তি। অনেক মুসলমান অজ্ঞতার ভিত্তিতে ইসলাম মানে শান্তি বলে। অনেকে আবার ইসলামের 'জিহাদ' ও বাতিলের সাথে ইসলামের অনিবার্য দ্বন্ধ ও সংঘাতকে এড়ানোর জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের অর্থ শান্তি করে থাকে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ আর তার মুসলিম নামধারী চামচারা ইসলাম মানে শুধুই শান্তি বলতে ভালবাসে। অথচ 'হানসভে'র নামে একজন খ্রীষ্টান তার বিখ্যাত আরবী-ইংরেজী অভিধানে ইসলামের অর্থ করেছে ঃ **Submission, to the will of God.** আল্লাহর ইচ্ছার কাছে (জীবনের সকল বিষয়ে) বশ্যতা স্বীকার করা ও সমর্পণ করা। (A Dictionary of Modern written Arabic)| তবে এ কথা ঠিক যে ইসলাম মানলে অবশ্যই শান্তি আসবে। দুনিয়াতে সুখ ও শান্তি লাভ করা যাবে। আর আখেরাতেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করা যাবে।

যদি কোন চিকিৎসক এসে কোন দৃষ্টিহীনকে বলে "আমি তোমার দুই চোখ ভাল করে দিব, বিনিময়ে তুমি আমার দাস হয়ে থাকবে। তাহলে যে কোন অন্ধ সাথে সাথেই রাযী হয়ে যাবে। কারণ দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার চেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে ! অথচ আল্লাহ আমাদের কত অসংখ্য নিয়ামত না চাইতেই বিরামহীনভাবে দান করে চলেছেন। এই নিয়ামত সম্পর্কে আমাদের আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর উম্মত করে সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলামের ন্যায় এত বড় একটা নিয়ামত দান করেছেন বলে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ্র শোকর আদায় করে থাকে। এমন কি, স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাও ইসলামকে মানুষের প্রতি এতসব নেয়ামতের মাঝে সবচেয়ে বড় ও উৎকৃষ্ট নিয়ামত বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেনঃ

"আজ আমি তোমাদেরকে আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান) পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।" (আল-মায়েদা ঃ ৩)

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের প্রতি এই যে, অনুগ্রহ করেছেন, এর হক আদায় করা তাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। কারণ যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের হক আদায় করে না, সে বড়ই অকৃতজ্ঞ। আর সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার এ বিরাট অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া।

ইসলামের মূল উৎস দু'টি ঃ কুরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা যতক্ষণ এগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহ্‌র কিতাব, আরেকটি হলো আমার সুন্নাহ্‌।" [বুখারী [

ইসলাম ও মুসলিম ঃ ইসলাম অর্থ আদেশ পালন করে চলা। আর দ্বীন হলো সেই আদেশ যা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে করা হয়। আল্লাহ্‌র সম্মুখে নিজের আযাদী ও স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করার নাম ইসলাম। যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত কাজ-কারবারকে আল্লাহ্‌র হাতে সঁপে দেয়, সেই ব্যক্তি মুসলমান। আর যে ব্যক্তি নিজের সব ব্যাপার নিজের ইচ্ছামত সম্পন্ন করে কিংবা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারোও হাতে তা সোপর্দ করে সে মুসলমান নয়। আল্লাহ্‌র হাতে সঁপে দেয়ার তাৎপর্য এই যে, তিনি তাঁর কিতাব এবং তাঁর নবীর মারফত যে হেদায়াত ও সৎপথের বিধান পাঠিয়েছেন, মানুষ তাকে পুরোপুরি কবুল করবে এবং তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করতে পারবে না। জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে এবং কাজে শুধু পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নিয়ম অনুসরণ করে চলবে। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ব্যাপারেই কেবল আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের হাদীসের কাছে পথের সন্ধান জানতে চায়– জিজ্ঞেস করে যে, আমার কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়, আর সেখান হতে যে নিয়মই পাওয়া যাক না কেন বিনা আপত্তিতে তা মেনে নেয়, তার বিপরীত যা তা সবই সে অস্বীকার করে–শুধু সেই ব্যক্তি মুসলমান। এর বিপরীত যে ব্যক্তি নিজের মন যা বলে তাই করে, কিংবা দুনিয়ায় যা কিছু হচ্ছে সে-ও তাই করে, নিজের কোন ব্যাপারেই সে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধান জেনে সে বলে ওঠে যে, আমার বুদ্ধি তা গ্রহণ করতে চায় না, তাই আমি তা মানি না, অথবা বাপ-দাদার কাল হতে তার উল্টা নিয়ম চলে আসছে কাজেই তার অনুসরণ করব না; কিংবা দুনিয়ার নিয়ম তার বিপরীত, তাই আমি সেই নিয়ম অনুসরারেই চলবো–তবে সেই ব্যক্তি কিছুতেই মুসলমান নয়। যদি সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, তবে সে মিথ্যাবাদী সন্দেহ নেই।

আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার আদেশ

মুসলিম হলো যে আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলে এবং তাঁর আদেশ লংঘন করে না। আল্লাহ্‌ তায়ালার আদেশ দুই প্রকার। তাকভিনী (সৃষ্টিগত) ও তাশ্‌রিয়ী (শরীয়ত গত) আদেশ।

১. তাক্‌ভিনী (সৃষ্টিগত) ঃ বাধ্যতামূলকভাবে আদেশ নিষেধ পালন করাই হলো তাকভিনী (সৃষ্টিগত) ইসলাম। যেমন, সূর্যের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ হচ্ছে উদয় হওয়া, অস্ত যাওয়া, আলো ও উষ্ণতা দেয়া ইত্যাদি। সূর্যের শক্তি নেই এই আদেশ অস্বীকার করার। সেরূপে বায়ুর প্রতি আদেশ প্রাণী জগতকে জীবিত রাখা। পানির প্রতি আদেশ তৃষ্ণার্তকে পানি দিবে। এরূপ মানুষের প্রতি সৃষ্টিগত আদেশ হলো জিহ্বা কথা বলবে, কান কথা শুনবে, চোঁখ দেখবে।

মানুষের ক্ষমতা নেই জিহ্বা দ্বারা দেখার বা কান দিয়ে কথা বলার অর্থাৎ এই আদেশ লংঘন করার। আর এটাই হলো আক্‌ভিনী (সৃষ্টিগত) ইসলাম।

২. তাশ্‌রিয়ী (শরীয়তগত) ঃ যে সব আদেশ নিষেধ যা পালনের জন্মগত বা সৃষ্টিগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই তাই হচ্ছে তাশরিয়ী আহকাম। যা স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যেমন মানুষ এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে না অন্য কারো ইবাদত বা হুকুমের অনুসরণ করবে তা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। শুধুমাত্র মানুষ ও জ্বীনকে এই ধরনের স্বাধীনতা আল্লাহ্‌ তা'য়ালা দান করেছেন।

সুতরাং আনুগত্য করার নাম হলো ইসলাম। ইসলাম ও মুসলিম হবার বিষয়টি শুধুমাত্র মানুষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম কোন এক বিশেষ সৃষ্টির নয়, গোটা সৃষ্টি জগতের দ্বীন হলো ইসলাম। সূর্য, চন্দ্র, সবই আল্লাহ্‌র আহকাম পুরোপুরি মেনে চলে। অতএব সূর্য সেও মুসলিম, চন্দ্র সেও মুসলিম। তারকারাজি, বায়ু, পানি সবাই মুসলিম।

আগুনের প্রতি আল্লাহর হুকুম আলো দিবে, তাপ দিবে, জ্বালাবে। আগুনের এখতিয়ার নেই অন্য কাজ করার। কিন্তু এই আগুনেই যখন ইব্রাহিম (আঃ) কে নমরুদ ও তার সঙ্গী সাথীরা ফেলেছিল, তখন আগুনের প্রতি আলাহ তায়ালার হুকুম ছিলঃ "হে আগুন ইব্রাহীমের প্রতি সু-শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।" আল্লাহর হুকুমে আগুন ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য তার বৈশিষ্ট পরিবর্তন করেছিল এবং উনাকে জ্বালাবার বদলে আরাম ও শান্তি দিয়েছিল। তাই আগুন মুসলিম।

"(সত্য অস্বীকারকারীর দল কি) আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোন দ্বীনের অনুসন্ধান করে? অথচ আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তারা সকলেই আল্লাহ্‌র দ্বীনের অনুগত।" (আলে-ইমরানঃ ৮৩)

"সাত আসমান পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌ তায়ালার তাসবীহ পাঠ করে। এ সৃষ্টিজগতে এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ (পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা) বুঝতে পারোনা।" (বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪)

"তোমরা কি লক্ষ্য করনি যে, বস্তুত ঃ আল্লাহ্‌ই এক সত্তা যাকে সেজ্‌দা করে সকলেই , যারা আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এবং সেজদা করে সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষরাজি, চতুষ্পদ জন্তু ও বহুসংখ্যক মানুষ।"

(সূরা আল হাজ্জ ঃ ১৮) [সেজদা করার প্রকৃত মর্ম, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র আরোপিত আইন, কানুন, বিধি, ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলা।]

অতএব জ্বীন ও মানুষ ব্যতীত সব সৃষ্টি আল্লাহ্‌র মুসলিম (আনুগত্যশীল) তাদের সকলের দ্বীন হলো ইসলাম।

আবার অনেক সময় একই সাথে উপরোক্ত দু' ধরনের আহ্কামের উপস্থিতি দেখা দেয়। যেমনঃ (মানুষের ক্ষেত্রে) আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে চোখ দিয়েছেন যেন মানুষ চোখ দ্বারা দেখবে কিন্তু চোখের জন্য আল্লাহর শরীয়ী হুকুম চোখ যেন কোন নিষিদ্ধ বিষয় বা কাজ না দেখে, তবে এই হুকুমের অনুসরণ নির্ভরশীল যে ব্যক্তিকে চোখ দেয়া হয়েছে তার ইচ্ছার উপর। আবার কান দ্বারা শুনবে কিন্তু নিষিদ্ধ কথা শুনবে না। এখানে দেখা যাচ্ছে প্রথম অংশটি তাক্ভিনী যা বাধ্যতামূলক এবং পরের অংশটি তাশরিয়ী (শরীয়তগত) যা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এখন আসল কথা হলো যারা আহকামে এলাহী (আল্লাহর দেয়া শরীয়ত) মানে না তাদের জন্য **"মুসলিম"** শব্দটি ব্যবহার করা চলবে না। অথচ তারা তাক্ভিনী (সৃষ্টিগত) আহকাম মেনে চলছে।

"বর্তমান যুগে ইসলাম যেভাবে অনুশীলন করা হয়"

বর্তমানে ইসলাম কয়েকটি অনুষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। মানুষ কিছু ইবাদাতের সমষ্টির নাম দিয়েছে ইসলাম। জীবনের অন্যান্য বিষয়ের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমান সময়ে মানুষের কর্মজীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে-

১. ইবাদতের বিশেষ বিশেষ সময়ে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করা।

২. অতপর জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে গাইরুল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করবে, অর্থাৎ শির্ক, কুফরী, হারাম, হালাল ইত্যাদির তোয়াক্কা করবে না।

অথচ, সাহাবারা তাদের গোটা সত্তাকে আল্লাহ্র নিকট পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের চিন্তা, চেতনা এবং কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এক আল্লাহ্র অনুগত্য হয়ে গিয়েছিল।

"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল, এই যে ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী রাসূলগণের উপর; আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্যধারণকারী, তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।"

(সূরা বাকারাহ্ ঃ ১৭৭)

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, মুমিন হওয়ার আকাংখা করা এবং মুমিনের মত অবয়ব বানিয়ে নিলেই ঈমান সৃষ্টি হয় না, বরং ঈমান সেই সুদৃঢ় আকীদা যা হৃদয়ের মাঝে পূর্ণরূপে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং যাবতীয় কাজ তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

ইসলামের দাবি ঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেনঃ

"ওহে যারা ঈমান এনেছো পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর।" (বাকারা ঃ ২০৮)

ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশের অর্থ হচ্ছে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানতে হবে। আমাদের জীবনের সকলের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান অনুসরণ করতে হবে। ইসলামের কিছু বিধান মানা আর কিছু বর্জন করা চলবে না। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবেই মানতে হবে। ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানার ব্যাপারে একজন মুসলমানের মূল বক্তব্য হবেঃ

"নিশ্চয় আমার নামায, আমার ইবাদতসমূহ এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু ঐ আল্লাহ্র জন্য যিনি বিশ্বজাহানের রব। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। এভাবেই আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আত্মসমর্পণকারী ও আনুগত্যশীল।" (আন-আম ঃ ১৬২-১৬৩)

একজন সত্যিকার মুসলমান সেই যার সকল ইবাদত ও তার জীবনের সকল কাজকর্ম হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। এক মুহূর্তের জন্যও সে আল্লাহ্র আনুগত্যের বহির্ভূত হবেনা। সে কখনো আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না। আমৃত্যু সে শির্কমুক্ত থাকবে। আর তার মৃত্যুও হবে ইসলামের উপর। এদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেছেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে যেমনভাবে ভয় করা দরকার ঠিক তেমন ভাবে ভয় করো। আর তোমরা অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

(আলে ইমরান ঃ ১০২)

আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন ইসলাম

ইসলাম আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন। ইসলাম ছাড়া আর কোন দ্বীন আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআন মজীদে এরশাদ করেছেনঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম"। (আলে ইমরানঃ ১৯)

"কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চায় তা কখনো গ্রহণযোগ্য হবেনা।" (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

যদি একদল মানুষকে (পুরুষ, মহিলা, শিশু) উলঙ্গ অবস্থায় কোন গহিন অরণ্যে রেখে আসা হয় এবং কয়েক মাস পরে সেখানে দেখা যাবে যে তারা নিজেদের মাঝে একটা জীবন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। অর্থাৎ তারা পোশাক পরিধান করবে, বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে, সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা কায়েম করবে। অথচ একদল, গরু, ছাগল, হাতী বা বাঘকে সেই স্থানে রেখে কয়েক মাস পরে গেলে দেখা যাবে যে তারা যেই অবস্থায় রাখা ছিল সেই অবস্থায় রয়েছে হয়ত শুধু প্রজনন বৃদ্ধি ঘটেছে এতটুকুই। অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) **'আশরাফুল মাখলুকাত' বা** সৃষ্টির সেরা জীব

বানিয়েছেন, তা শক্তির দিক থেকে কিংবা আকারের দিক থেকে নয় বরং জ্ঞানের দিক থেকে এবং সুন্দরতম অবয়বের দিক থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন যে মানুষ তার চিন্তা ভাবনা ও জ্ঞান দিয়ে হাজার রকম নিয়ম কানুন বানাতে পারবে। কিন্তু প্রতি যুগেই মানব জাতির জন্য আল্লাহর হুকুম হল মানুষ যেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানই মেনে নেয়। এটাই তার ইবাদত বা হুকুমের অনুসরণ মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি, এটাই তার দুনিয়ার জীবনের পরীক্ষা। এরই জন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেদিন থেকে দুনিয়াতে প্রথম মানুষ পাঠালেন সেদিনই তাকে জানিয়ে দিলেন-

"আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তস্ত্র হবে। আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অনন্তকাল সেখানে থাকবে।" (আল-বাকারা ঃ ৩৮-৩৯)

অর্থাৎ আদম (আঃ) কে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা দুনিয়াতে 'হুদা, হেদায়েত, জীবন ব্যবস্থা পাঠাবেন এবং যে মেনে নেবে অর্থাৎ মুসলিম হবে সে আবার জান্নাতে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে।

"এমন কোন জাতি ছিল না যাদের কাছে কোন সাবধানকারী (নবী) আসেনি।" (সূরা ফাতের ঃ ২৪)

উপরের এ দুটি আয়াত একথারই সুস্পষ্ট ঘোষণা করে যে, এ দুনিয়ার মানুষের বসবাস এবং শরীয়তের আহকাম একত্রেই শুরু হয়েছে। সেই আদিকাল থেকে মানবজগত কখনো 'দ্বীন' ও 'শরীয়ত' শূন্য হয়ে পড়েনি। দ্বীন ও শরীয়াতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দ্বীন চিরকালই এক ছিল এক আছে এবং চিরকাল একই থাকবে; কিন্তু শরীয়াত দুনিয়ায় বহু এসেছে, বহু বদলিয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীন যা ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর দ্বীনও তাই ছিল, হযরত মূসা (আঃ)-এর দ্বীন যা ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর দ্বীনও তাই ছিল, হযরত মূসা (আঃ)-এর দ্বীনও তাই ছিল এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দ্বীনও ঠিক তাই। আর তা হচ্ছে ইসলাম। কিন্তু এই নবীগণের প্রত্যেকেরই শরীয়াতে কিছু না কিছু পার্থক্য বর্তমান ছিল। নামায এবং রোযার নিয়ম এক এক শরীয়াতে এক এক রকমের ছিল। হারাম ও হালালের হুকুম, পাক-পবিত্রতার নিয়ম, বিয়ে ও তালাক এবং সম্পত্তি বন্টনের আইন এক এক শরীয়াতের এক এক রকম ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন। হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-এর উম্মতগণও মুসলমান ছিলেন, আর আমরাও মুসলমান কেননা সকলের দ্বীন ইসলাম। এমন জাতি নেই যে,

আল্লাহ্ তায়ালার হেদায়েত থেকে বঞ্চিত ও অনবহিত রয়েছে। এটা এ জন্য যে, মানুষ ছিল একটা স্বাধীন এখতিয়ার সম্পন্ন সৃষ্টি।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তার বংশধর হযরত ইসমাইল (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রমূখ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

"শুনো সে সময়ের কথা যখন ইব্রাহীমকে তাঁর প্রভু বলেছিলেন 'মুসলিম হও অর্থাৎ আমার অনুগত হয়ে যাও।" তখন তার জবাবে তিনি বলেছিলেন 'আমি জগতসমূহের প্রভুর মুসলিম অর্থাৎ অনুগত হয়ে গেলাম।' অতঃপর এ বিষয়ে অসিয়ত করলেন ইব্রাহীম তার পুত্রদেরকে এবং ইয়াকুব তাঁর পুত্রদেরকে এই বলে, 'হে আমার সন্তনগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই বিশেষ দ্বীনটি পছন্দ করেছেন। অতএব জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তোমরা মুসলিম হয়ে থেকো। ... .. তারা বললোঃ আমরা আপনার ইলাহ্র বন্দেগী করব ... .. এবং আমরা তাঁরই মুসলিম (অনুগত) হয়ে থাকবো।" (আল বাকারা ঃ ১৩১-১৩৩)

কুরআন পাকে এ ধরনের বিশ্লেষণ হযরত লূত (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) প্রমূখ নবীগণের সম্পর্কেও দেয়া হয়েছে। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা দ্বীন। সকল নবী রাসূলগণের দ্বীন একটিই ছিল আর তা হচ্ছে ইসলাম। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "নবীরা ভাই ভাই --- আর তাঁদের সকলের দ্বীন এক।' (বুখারী ও মুসলিম)

সকল নবীর অনুগত উম্মতই যে মুসলিম এ ব্যাপারে এরশাদ হচ্ছেঃ "তিনি তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন প্রথম থেকেই এবং এ কোরআনেও।" (সূরা আল হজ্জ ঃ ৭৮)

অতএব জানলাম সকল নবী-রাসূলগণের এ দ্বীনের নাম হলো ইসলাম। তবে ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রিসালাতের মাধ্যমে অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর তরফ থেকে শেষ আসমানী কিতাব আল কুরআন প্রাপ্ত হয়েছেন এবং শরীয়ত নিয়ে এসেছেন। যেমন কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির সকলের জন্যই তিনিই একমাত্র আদর্শ এবং উনার আনীত শরীয়ত মেনে নিয়ে আমল করলে মুসলিম থাকা যাবে। অন্যথায় কাফের হয়ে যাবে। এরশাদ হচ্ছে ঃ **"আজ আমি তোমাদেরকে আনুগত্যের বিধান (জীবন বিধান) পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।" –(মায়েদা ঃ ৩)**

এ আয়াত নাযিলের দ্বারা সকল নবীর দ্বীনের (ইহুদী খৃষ্টান) অনুসারীদেরকে হুকুম করে দেয়া হয়েছে তারা যেন রাসূল (সাঃ) এর আনীত দ্বীন ও শরীয়তের উপর ঈমান এনে আমল করে। নতুবা তারা শত আমলই করুক কাফের অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নাম হবে তাদের পরিণতি।

মুহাম্মদ (সঃ) এর রিসালাতের প্রতি ঈমানঃ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "কসম সেই সত্তার, মুহাম্মাদের জীবন যার মুষ্টিবদ্ধ! যদি মূসা (আঃ)-এর পুনরাবির্ভাব ঘটে আর তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তাঁর অনুসরণ করো, তবে অবশ্য তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। মুসা (আঃ) যদি আমার নবুওয়াত পর্যন্ত বেঁচে থাকতেন, তবে অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন" অপর একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ "আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোনো গত্যন্তর থাকতো না"। (দারেমী, মুসনাদে আহমদ, মিশকাত)

রাসূলুলাহর (সাঃ) অনুসরণ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না তার ইচ্ছা ও খায়েশ সে শরীয়তের পূর্ণ অনুগত হয়ে যায়, যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি" (শরহে সুন্নাহ, মিশকাত)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুহ্ববত ঃ আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষের তুলনায় অধিক প্রিয় হই" (মিশকাত কিতাবুল ঈমান)।

উদাহারণ স্বরূপ বিয়ের ব্যাপারে অনেক নিয়ম কানুন আছে। হিন্দু, ইহুদী, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বাতিল জীবন বিধানে বিয়ের অনেক ফর্মুলা আল্লাহ্‌র কিতাব বিকৃত করে মানুষ তার চিন্তা ভাবনা মিশিয়ে বের করেছে। অথচ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিয়ের জন্য রাসূল (সাঃ)-এর শরীয়ত মোতাবেক- মুসলিমকে শুধু মুসলিমাকে বিয়ে করতে বলেছেন, দেন মোহর দিতে বলেছেন, দুইজন সাক্ষী নিতে বলেছেন, ওয়ালি নিযুক্ত বা কবুল করতে বলেছেন। এখন যদি কেউ বলে, যে কোন তিনটা শর্ত মানি আর একটা মানিনা অর্থাৎ মুসলিমা বিয়ে করবো না, হিন্দু (মুশরিকা) বিয়ে করবো অথবা মুসলিমা বিয়ে করবো কিন্তু দেন মোহর দিব না বা ধার্য্য করব না তাহলে কি এটা 'ইসলামিক' বিয়ে হবে? মোটেও না, আল্লাহ্‌র ফরজ করা কোন বিষয়কে সদিচ্ছায় ত্যাগ করলে কিংবা আংশিক নিলে সেটা আর ইসলাম থাকে না, অন্য বাতিল দ্বীন হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এরশাদ করেছেনঃ

"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে এমন দ্বীন ঠিক করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ্‌ তায়ালা দেননি? ফায়সালার সময় যদি পূর্ব নির্ধারিত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (সূরা আশ-শূরা-২১)

গণতন্ত্র যে একটা দ্বীন তার সবচেয়ে ছোট প্রমাণ হল গণতন্ত্র দ্বীন মোতাবেক একজন মুসলিম একজন মুশরিকাকে বিয়ে করতে পারবে তবে তাকে কাজী অফিসে না যেয়ে কুফর আদালতে যেতে হবে কারণ গণতন্ত্রী সংবিধান অনুযায়ী তাকে নাগরিক অধিকার দেয়া হয়েছে কাফের মুশরিককে বিয়ে করার।

"বিধান দেয়ার একচছত্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র।" (ইউসুফ ঃ ৪০)

এ রকম ইসলামের হুকুমের বাইরে বিয়ে করলে আল্লাহ্‌র নিকট তাদেরকে স্বামী স্ত্রী হিসাবে গণ্য করা হয় না এবং তাদের মিলন অবৈধ সম্পর্কে পরিণত হয়। [[বিঃ দ্রঃ মুশরেককে মুসলিম হওয়ার আহবান করলে এবং সে তা কবুল করলে অবশ্যই তাকে বিয়ে করা যায়। আহলে কিতাব মেয়েদের বিয়ে করার বিষয়ে ফিকাহবিদদের মাঝে এখতেলাফ বা মত পার্থক্য রয়েছে।]

এমনিভাবে আমাদের জীবনে চলার জন্য অনেক রকম বিষয়াদি রয়েছে। জীবনের প্রত্যেকটি কাজের সময় একটা প্রশ্ন এসে উপস্থিত হয়। কোন নিয়ম অনুযায়ী এ কাজ করবো? এ সময় আমরা দু'প্রকার নিয়ম দেখতে পাই। এক প্রকার হল আল্লাহ্‌র কুরআন আর রাসূলের সুন্নাত থেকে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী হুকুম বা নিয়ম পদ্ধতি। আর অন্য প্রকার হল কুরআন সুন্নাহ ব্যতীত যা কিছু আছে অর্থাৎ সেটা মানুষের নিজস্ব মাথা থেকে (শয়তানের সহযোগীতায়) বানানো অপরিপক্ক জীবন ব্যবস্থা সমূহ যা নাকি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, পুজিবাদ ইত্যাদি নানান নামে ঢংয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। মজার ব্যাপার হল এ সমস্ত মতবাদ সকল বাতিল ধর্মের অনুসারীরা (ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধরা) সহজে গ্রহণ করে নেয় কারণ তাদের মাঝে যেসব ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসেছিল সেইগুলিকে মানুষ বিকৃত করে ফেলেছে। তাই সেখানে তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রের সমাধান না পেয়ে ইবাদতকে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রেখে ভগবান, গডকে মন্দিরে, গীর্জায় আর পেগোডায় নিয়ে আটকে রেখেছে এবং জীবনের বাকি সকল কাজসমূহঃ রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা মানুষ আর শয়তান দ্বারা রচিত আইনের দ্বারা সাজানো জীবন ব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু জীবনের সকল বিষয়াদি পরিপূর্ণ সমাধান নিয়ে রাসূল (সাঃ) এসেছিলেন। তাই কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমকে আল-কুরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত (সহীহ হাদীস) থেকে জীবনের চলার পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে।

মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য

প্রত্যেক মুসলমান নিশ্চয়ই একথা জানে যে, আল্লাহ্‌ তা'য়ালা মুসলমানকে পছন্দ করেন এবং কাফেরকে অপছন্দ করেন। মুসলমানের গোনাহ্‌ ক্ষমা করা হবে কাফেরের অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। মুসলমান জান্নাতে যাবে এবং কাফের জাহান্নামে। কিন্তু মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে এতখানি পার্থক্য কেন হলো, সেই সম্বন্ধে একটু গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।

কাফের ব্যক্তিরা যেমন হযরত আদম (আঃ)-এর সন্তান, মুসলমানরাও তেমনি তাঁর সন্তান। মুসলমানদের মত তাদেরও হাত-পা, চোখ-কান সবই আছে। তাদের জন্ম এবং মৃত্যু মুসলমানদের মতই হয়। যে আল্লাহ্‌ মুসলমানদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাহলে মুসলমান কেন জান্নাতে যাবে আর তারা কেন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে? একথাটি

বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখা আবশ্যক। মুসলমানদের এক একজনের নাম রাখা হয়েছে আবদুল্লাহ, আবদুল হামিদ বা তদনুরূপ অন্য কোন নাম, অতএব তারা মুসলমান। আর কিছু লোকের নাম রাখা হয়েছে দীলিপ, জগদীশ, জন প্রভৃতি, কাজেই তারা কাফের; কিংবা মুসলমানগণ খাত্না করায়, আর তারা তা করায় না। মুসলমান গরুর গোশত খায়, তারা তা খায় না– শুধু এটুকু কথার জন্যই মানুষে মানুষে এতবড় পার্থক্য হতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালাই যখন সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকেই তিনি লালন-পালন করেন তিনি এতবড় অন্যায় কখনও করতে পারেন না। কাজেই তিনি এ রকম সামান্য বিষয়ের কারণে তাঁর সৃষ্ট এক শ্রেণীর মানুষকে অকারণে দোযখে নিক্ষেপ করবেন তা কিছুতেই হতে পারে না।

বস্তুত উভয়ের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কেবলমাত্র কুফরি ও ইসলামের। ইসলামের অর্থ-আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা এবং কুফরীর অর্থ আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, অমান্য করা ও আলাহ্ তাআলার অবাধ্য হওয়া। মুসলমান ও কাফের উভয়ই মানুষ, উভয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্ট জীব, তাঁরই আজ্ঞাবহ দাস। কিন্তু তাদের একজন অন্যজন অপেক্ষা এজন্য শ্রেষ্ঠ যে, একজন নিজের প্রকৃত মনিবকে চিনতে পারে, তার সাথে কাউকে শরীক করে না, তাঁর আদেশ পালন করে এবং তাঁর অবাধ্য হওয়ার দুঃখময় পরিণামকে ভয় করে। কিন্তু অন্যজন নিজ মনিবকে চিনে না এবং তাঁর আদেশ পালন করে না, এজন্যই সে অধঃপাতে চলে যায়। এ কারণেই মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালা সন্তুষ্ট এবং কাফেরের প্রতি অসন্তুষ্ট, মুসলমানকে জান্নাতে দেয়ার ওয়াদা করেছেন এবং কাফেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ভয় দেখিয়েছেন।

"যেসব লোক ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, নিঃসন্দেহে তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।" (সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৭-৮)

মুসলমানকে কাফের হতে পৃথক করা যায় মাত্র দু'টি জিনিসের ভিত্তিতেঃ প্রথম, ইল্ম বা জ্ঞান; দ্বিতীয়, আমল বা কাজ। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানকে প্রথমেই জানতে হবে যে, তার প্রকৃত মালিক কে? কি তাঁর আদেশ ও নিষেধ? কিসে তিনি সন্তুষ্ট হন আর কিসে তিনি অসন্তুষ্ট হন এসব বিস্তৃতভাবে জেনে নেয়ার পর মালিকের মর্জিমত চলবে, তার মন যদি মালিকের ইচ্ছার বিপরীত কোন বস্তুর কামনা করে তবে সে নিজের মনের কথা না শুনে মালিকের কথা শুনবে। কোন কাজ যদি নিজের কাছে ভাল মনে হয়, কিন্তু মালিক সেই কাজটিকে ভাল না বলেন, তবে তাকে মন্দই মনে করবে। আবার কোন কাজ যদি নিজের মনে খুব মন্দ বলে ধারণা হয়, কিন্তু মালিক তাকে ভাল মনে করেন এবং কোন কাজ যদি নিজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে হয় অথচ মালিক যদি তা

করার হুকুম দেন, তবে তার জান ও মালের যতই ক্ষতি হোক না কেন, তা সে অবশ্যই করবে। আবার কোন কাজকে যদি নিজের জন্য লাভজনক মনে করে, আর মালিক তা করতে নিষেধ করেন তবে তাতে দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পত্তি লাভ করতে পারলেও তা সে কখনই করবে না। ঠিক এ ইলম ও এরূপ আমলের জন্যই মুসলমান আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রিয় বান্দাহ। তার ওপর আল্লাহ্ তাআলার রহমত বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ্ তা'য়ালা তাকে সম্মান দান করবেন। উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কাফের কিছুই জানে না এবং জ্ঞান না থাকার দরুনই তার কার্যকলাপ ও তদ্রুনরূপ হয় না। এ জন্য সে, আল্লাহ্ তাআলা সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ এবং তাঁর অবাধ্য বান্দাহ। ফলত সে আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হবে।

যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, অথচ কাফেরদের মতই জাহেল বা অজ্ঞ এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার অবাধ্য, এমতাবস্থায় কেবল নাম, পোশাক ও খানা-পিনার পার্থক্যের কারণে সে কাফের অপেক্ষা কোনভাবেই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না, আর কোন কারণেই সে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের হকদার হতে পারে না। এরশাদ হচ্ছেঃ

"ইহাদিগকে জিজ্ঞাস কর, যে জানে ও যে জানে না ইহারা উভয় কি কখনো সমান হতে পারে? বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই তো নসীহত কবুল করিয়া থাকে।")

(যুমার ঃ ৯)

"প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলম সম্পন্ন লোকেরাই তাঁহাকে ভয় করে।" **(ফাতির ঃ ২৮)**

ইল্ম (জ্ঞান) হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যে বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে ইলম বা জ্ঞান দান করেন। এটা সেই জ্ঞান যা ওহী হিসাবে মহান আল্লাহ্ নাযিল করেছিলেন রাসূল (সাঃ) এর প্রতি কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞান এবং এর থেকে উদ্ভুত শাখা প্রশাখাসমূহ। ওহীর এই জ্ঞান এতই মর্যাদাপূর্ণ যে একে ইলম শরীফ হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

"আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন জ্ঞান জানিয়ে দিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না। বস্তুতঃ তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ বিরাট।" **(আন নিসা ঃ ১১৩)**

এটাই হচ্ছে সেই জ্ঞান যাহা মৃত হৃদয়কে জীবন্ত ও আলোকিত করে এবং বিপন্ন মানবতাকে অন্ধকারের গভীর থেকে আলোতে নিয়ে আসে।

"যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমরা তাহাকে জীবন দান করিলাম এবং তাহাকে সেই রৌশনী দান করলাম যাহার আলোক-ধারায় সে লোকদের মধ্যে জীবন-যাপন করে, সে কি সেই ব্যক্তির মত হইতে পারে, যে ব্যক্তি অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহা হইতে কোনক্রমেই

বাহির হয়না? কাফেরদের জন্য এই রকমই তাহাদের আমলকে চাকচিক্যময় বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" (সূরা আন'আম ঃ ১২২)

যাদেরকে কুরআনে বলা হয়েছে সবচেয়ে ভাল এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী তারা হচ্ছে সেইসব লোক যারা ইল্‌ম অর্জন করে, সে অনুযায়ী আমল করে ও অন্যদের কাছে তা পৌছিয়ে দেয় (আহলুল ইলম)। কিন্তু দলীল রয়েছে যে, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে না তারা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত।

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা কেন সেই কথা বল যাহা কার্যতঃ কর না? আল্লাহ্‌র নিকট ইহা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা বলিবে এমন কথা যাহা কর না" (আস-সাফ ঃ ২-৩)

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর 'মাজমুআ আল-ফাতওয়াতে' বলেন যে যারা ইল্‌ম অর্জন করে তাঁরা হচ্ছেন আম্বিয়া কেরামের উত্তরাধিকারী ও রাসূল (সাঃ) এর খলিফা। তাঁরা সেই মাটির মত যেখানে পানি জমা হয় ও সবুজ ঘাস জন্মে। আলাহ ঈমানদারগণকে সেই জ্ঞান দান করেন যা তারা জানত না, এরশাদ হচ্ছে

"যেমন (এই দিক দিয়া তোমরা কল্যাণ লাভ করিয়াছ যে,) আমি তোমাদের প্রতি স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য হইতে একজন রসূল পাঠাইয়াছি, যে তোমাদিগকে আমার আয়াত পড়িয়া শুনায়; তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করিয়া তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের অজ্ঞাত, তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দেয়।" (বাকারাহ ঃ ১৫১)

আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূল (সাঃ) কে শিক্ষা দিয়েছেন যেন তিনি ইলম বৃদ্ধির জন্য (আল্লাহর) কাছে প্রার্থনা করেন ঃ **"আর দোয়া কর, হে পরোয়ারদিগার! আমাকে আরও অধিক ইলম দান কর।"** (তা-হাঃ ১১৪)

জ্ঞানের মধ্যে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞানই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ তাওহীদের জন্যই আল্লাহ তার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। এরশাদ হচ্ছেঃ

"হে নবী জেনে রাখো- আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই (লা ইলাহা ইলাল্লাহ)। ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ত্রুটির জন্য এবং মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত।" (মুহাম্মদ ঃ ১৯)

বিষয়টা খুবই সহজ বুঝার জন্য। একজন ডাক্তারের ঘরে জন্মেছে বলেই উনার ছেলে যেমন ডাক্তার নয় অর্থাৎ ডাক্তারের ছেলে বলে রুগি দেখে অষুধ দিতে পারে না কিংবা দিলেও কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না। তাকে অবশ্যই ডাক্তার হবার জন্য যে ইলম আবশ্যক তা কষ্ট করে হলেও হাসিল করতে হবে। এবং প্র্যাকটিস করতে হবে রুগি দেখার জন্য। ঠিক তেমনি মুসলিমের ঘরে জন্মেছে বলেই মুসলিম নয়। ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান হাসিল করতে হবে

এবং সে অনুযায়ী আমল করলেই মুসলিম হওয়া যাবে। ইসলাম কোন জাতি, বংশ বা সম্প্রদায়ের নাম নয়। কাজেই বাপ হতে পুত্র এবং পুত্র হতে পৌত্র আপনা-আপনিই তা লাভ করতে পারে না। হিন্দুদের মাঝে ব্রাক্ষণের পুত্র মুর্খ এবং চরিত্রহীন হলেও কেবলমাত্র ব্রাক্ষণের পুত্র বলেই সে ব্রাক্ষণের মর্যাদা পেয়ে থাকে এবং উচ্চ বংশ বলে পরিগণিত হয়। আর চামারের পুত্র জ্ঞানী ও গুণী হয়েও নীচ ও হীন থেকে যায়। কারণ সে চামারের মত নীচ জাতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। এখানে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যে লোক আল্লাহ্‌ তা'য়ালাকে বেশী ভয় করে এবং সকলের অধিক তাঁর আদেশ পালন করে চলে সে-ই তাঁর কাছে অধিক সম্মানিত।" হযরত ইবরাহীম (আঃ) একজন মূর্তিপূজারীর ঘরে জন্ম লাভ করেছিলেন; কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌ তা'য়ালাকে চিনতে পেরে তাঁর আদেশ পালন করলেন; এজন্য আল্লাহ্‌ তা'য়ালা তাঁকে এবং তার বংশধরের মাঝে যারা মুসলিম তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত জগতের রিসালাত, নবুয়ত ও খেলাফত অর্থাৎ নেতা বা ইমাম (খলীফা) করে দিয়েছেন।

"স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তাহার রব বিশেষ কয়েকটি ব্যাপারে যাচাই করিলেন এবং সেই সব কয়টি ব্যাপারেই সে উত্তীর্ণ হইল, তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতা করিতে চাহি।" ইবরাহীম বলিল-"আমার সন্তানদের প্রতিও কি এই ওয়াদা? তিনি উত্তরে বলিলেন, –"আমার এই প্রতিশ্রুতি যালেমদের [ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে যারা মুসলিম নহে শিরককারী] সম্পর্কে নহে।" (আল বাকারা ঃ ১২৪)

"আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদিগকে সমগ্র দুনিয়াবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দান করিয়া (ও নিজের নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য) মনোনীত করিয়াছিলেন।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩৩)

"তাহা হইলে ইহারা অন্যান্য লোকদের প্রতি [মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের] কি শুধু এইজন্য হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করিয়াছেন? যদি তাহাই হয় তবে তাহারা যেন জানিয়া রাখে যে, আমরা তো ইবরাহিমের সন্তানদিগকে কিতাব ও বুদ্ধি-বিজ্ঞান দান করিয়াছি এবং বিরাট রাজ্য দিয়াছি।" (সূরা নিসা ঃ ৫৪)

এখানে একটা বিষয় বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্‌ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাদের মালিক। তিনি যদি তাঁর অনুগত দাসদের ইবাদতে খুশী হয়ে কাউকে মর্যাদার আসনে বসান তাহলে অন্যান্য দাসদের এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। যেমনি ইব্রাহিম (আঃ) এর (আল্লাহর জন্য) কুরবানীতে সন্তুষ্ট হয়ে আলাহ্‌ সুবহানাহু তায়ালা যখন সমস্ত দুনিয়ার নেতৃত্ব দিতে চাইলেন (তার আগে থেকেই তিনি নবী ও রাসূল ছিলেন) তখন ইব্রাহিম (আঃ) উনার বংশধরদের মাঝেও যেন নেতৃত্ব দেয়া হয় তার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার বান্দা ইব্রাহিম (আঃ) এর দোয়া কবুল করলেন। কিন্তু পরিষ্কার শর্ত দিয়ে দিলেন যে- এ নেতৃত্ব শুধুমাত্র তার বংশধরদের মাঝে যারা মুসলিম হবে

তাদের জন্য অর্থাৎ তার বংশধরদের মাঝে কোন কাফের, মুশরিক এ নেতৃত্বের দাবীদার হতে পারবে না। পরবর্তীতে তাঁর দুই ছেলে ইস্হাক (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ) এবং তার বংশধরের মাঝে নবুয়ত, রেসালাত ও খেলাফতের দায়িত্ব অর্পন করলেন। এর ফলশ্রুতিতে ইব্রাহিম (আঃ) এর এক ছেলে ইসহাক (আঃ) এবং তার ছেলে ইয়াকুব (আঃ) নবী ছিলেন এবং ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরদের নামই বনী ইসরাইল এবং তাদের মাঝেই মুহাম্মদ (সাঃ) আসার আগ পর্যন্ত সমস্ত নবী, রাসুল এবং নেতৃত্ব (খেলাফত) এসেছে। রাসূল (সাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসঃ

"ইসরাইলের বংশধরদের কাছে অব্যাহতভাবে নবী পাঠানো হয়েছিল। বনি ইসরাইলের বংশধরগণের মাঝে নবীগণ শাসন ব্যবস্থা [TASOOSUHUM] প্রতিষ্ঠিত রাখতেন। একজন নবী ইন্তেকাল করলে আরেকজন নবীকে উনার খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। আমার পরে আর কোন নবী পাঠানো হবে না, তবে তোমাদের আমার পরে বহু খলিফাহ আসবেন। সাহাবীরা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ সময় আপনি আমাদিগকে কি করার নির্দেশ দেবেন, তিনি জবাব দিলেন, প্রথমজনকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি (বাইয়াহ) দেবে এবং এর পরের সর্ব প্রথমকে। তাদেরকে তাদের অধিকার দেবে, কেননা আল্লাহ্ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তারা (খলিফা) তাদের লোকদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পূরণ করেছে কি না।" [আল-বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত]

আবার ইব্রাহিম (আঃ) এর ছেলে ইসমাঈল (আঃ) নবী ছিলেন এবং তার বংশই কুরাইশ এবং এ কুরাইশ বংশেই শেষ নবী রাসূল (সাঃ) এসেছিলেন। ইব্রাহিম (আঃ) এর মুসলিম বংশধরদের প্রতি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নেতৃত্বের ওয়াদা মোতাবেক কুরাইশ বংশকে কিয়ামত পর্যন্ত খলিফার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যাহা রাসূল (সাঃ) কর্তৃক নিম্নলিখিত সিহাহ সিত্তাহ হাদীস গ্রন্থসমূহের সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এ 'আমর' অর্থাৎ খেলাফত কুরাইশদের মধ্যে সর্বদা বিরাজমান থাকবে। এমনকি তাদের মধ্য থেকে দু'জন লোক অবশিষ্ট থাকলেও। (সহীহ আল-বুখারী ঃ হাদীস নং- ৬৬৪১)

[বিঃ দ্রঃ অন্যান্য সহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমানিত যে, মুসলিমদের সর্বোচ্চ নেতা খলিফা বা আমীরুল মুমিনীননকে অবশ্যই মুসলিম কুরাইশ হতে হবে। এটা সাহাবা এবং আলেমদের এজমা। দুনিয়ার বুকে খারিজী আকিদার মুরতাদরা প্রথম রাসূল (সাঃ)-এর এই হুকুম অমান্য করে। তাদের অভিমত ছিল কুরাইশ ও অকুরাইশ যে কাউকে মুসলিম জনগণ খলিফা নিযুক্ত করতে পারবে। মুতাজিলা ও মুর্জিয়া আকীদার লোকজন বিভ্রান্তিতে আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে এই আকীদা পোষণ করে যে- কোন কুরাইশই খলিফা হতে পারবে না, কুরাইশ ছাড়া যে কোন মুসলিম খলিফা হতে পারবে। আরেকটা বিষয় বুঝতে হবে যে, খলিফার অধীনে অন্যান্য যে কোন আমির হওয়ার জন্য কুরাইশ কিংবা আরব হওয়ার শর্ত নয়। নাক

কাটা হাবশীকেও আমির (খাস) পদে" খলিফা নিয়োগ দিলে তার আনুগত্য করা মুসলিম জনগণের জন্য ওয়াজিব। খাস আমির হল যে কোন বিশেষ কাজের জন্য খলিফার নিয়োগ করা আমির যেমন ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন যে কোন অঞ্চলের আমীর কিংবা কোন সেনাবাহিনীর আমির কিংবা কোন সফরের আমীর। আর আম আমীর হল সকল মুসলিমের সর্বোচ্চ নেতা বা একমাত্র আমীর বা আমীরুল মু'মীনীন অর্থাৎ খলিফা। এই খলিফার নেতৃত্বে মুসলিম জনগণকে ইসলামী রাষ্ট্র থাকুক বা না থাকুক সবসময় একত্রে থাকতে হবে । অর্থাৎ খলিফা থাকার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র শর্ত নয়।]

হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র একজন নবী ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছিল; কিন্তু সে আল্লাহ্ তাআলাকে চিনতে পারল না বলে তাঁর অবাধ্য হয়ে গেল। এজন্য তার বংশমর্যাদার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হলো না। উপরন্তু যে শাস্তি দেয়া হলো, সমস্ত দুনিয়া তা হতে শিক্ষা লাভ করতে পারে। এরশাদ হচ্ছেঃ

"এবং নূহ তাঁর রবকে বললেন, পরওয়ারদিগার! আমার পুত্র অবশ্যই আমার পরিবারভুক্ত, আর আপনার ওয়াদা সত্য এবং আপনি মহাজ্ঞানী। প্রত্তুত্তরে আল্লাহ্ বলেন, নূহ, সে তোমার পরিবার ভুক্ত নয়, কারণ তার কার্যকলাপ সৎলোকদের মত নয় আর তুমি যে বিষয়ের তাৎপর্য অবগত নও সে বিষয়ে আমার নিকট কোন আবেদন করো না। [হূদ ঃ ৪৫-৪৭]

নূহ (আঃ) ও হযরত লূত (আঃ)-এর বিবিদের কাহিনীও কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'জন মহান নবীর বিবিগণ ভিন্ন আকীদা পোষণ করতেন এবং শিরককে লিপ্ত ছিলেন। সেজন্য উভয় পয়গাম্বরই তাঁদের বিবিদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

"কাফিরদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা নূহ ও লূতের বিবিগণের উদাহরণ পেশ করেছেন। এ দু'জন নারী আমার দু' নেক বান্দার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা খেয়ানত করেছিল। তাই তাদের স্বামীগণও তাদেরকে আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারেনি। উভয় নারীকে আদেশ দেয়া হয়, যাও অন্যান্যদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর।" (আত তাহরীম ঃ ১০)

মিসরের অত্যাচারী ও আল্লাহ্দ্রোহী বাদশা ফিরাউনের বিবির কাহিনীও ঈমানদারদের নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

"ঈমানদারদের নসিহত করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা ফিরাউনের স্ত্রীর বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি দোয়া করেছিলেন, পরওয়ারদিগার! বেহেশতে তোমার নিকটে আমার জন্যে একখানা ঘর তৈরী কর, আমাকে ফিরাউন ও তার সকল অপকর্মের পরিণাম থেকে মুক্তি দাও এবং যালেমদের অনিষ্টকারিতা থেকেও আমাকে নিরাপদ রাখ।" (আত তাহরীম ঃ ১১)

যাদের ইলম ও আমল নেই, তাদের নাম আবদুল্লাহই হোক, আর আবদুল হামিদ হোক, দীলিপ কুমারই হোক, আর জগদীশই হোক, আল্লাহ্ তাআলার কাছে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই- এরা কেউই আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ পাবার অধিকার পেতে পারে না।

মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে ইলম ও আমল, জ্ঞান ও কাজ ছাড়া আর কোন প্রভেদ নেই। কাফের পবিত্র কুরআন পড়ে না এবং তাতে কি লিখিত আছে তা সে জানে না। কিন্তু মুসলমানের অবস্থা যদি এ রকমই হয় তাহলে সে নিজেকে মুসলমান বলবে কোন অধিকারে? কাফের আল্লাহ্‌র মর্জি মত চলে না, চলে নিজ ইচ্ছামত; মুসলমানও যদি সেরূপ স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন নিজের খামখেয়ালীর বশবর্তী হয়, সেরূপই আল্লাহ্‌ প্রতি উদাসীন ও বেপরোয়া হয় তবে তার নিজেকে 'মুসলিম' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আদেশ পালনকারী বলার কি অধিকার আছে? কাফের হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করে না যে কাজে সে লাভ ও আনন্দ দেখতে পায় তা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে হালাল হোক কি হারাম হোক নিঃসংকোচে সে তাই করে যায়। মুসলমানও যদি এ নীতি গ্রহন করে তবে তার ও কাফের ব্যক্তির পার্থক্য রইল কোথায়? মোটকথা, কাফেরের ন্যায় মুসলমানও যদি ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ হয় এবং কাফের ও মুসলমানের কাজ-কর্ম যদি একই রকম হয় তাহলে দুনিয়ায় কাফেরের পরিবর্তে কেবল মুসলমানরাই সম্মান লাভ করবে কেন? কাফেরের ন্যায় মুসলমানরাও পরকালে শাস্তি ভোগ করবে না কিসের জন্য?

মুসলিমদের কেন এ পরিণতি

মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণকারী নিজেদের মুসলমান বলে মনে করে এবং সেই মুসলমানের উপর আল্লাহ্‌ তাআলার রহমত বর্ষিত হয় বলে বিশ্বাস করে। পক্ষান্তরে এই দুনিয়ায় মুসলমানদের যে দুরাবস্থা হচ্ছে তা একবার খেয়াল করে দেখা আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছেন, তা পড়ে মুসলমানগণ প্রকৃত মালিককে চিনতে পারে; কিন্তু ঐ কিতাবে যা লিখিত আছে, তা জানার জন্য মুসলমানগণ একটুও চেষ্টা করেছে কি? আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছেন, তিনি মুসলিম হওয়ার উপায় ও নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর নবী দুনিয়ায় এসে কি শিক্ষা দিয়েছেন, তা জানার জন্য তারা কখনও যত্নবান হয়েছি কি? আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে ইজ্জত লাভ করার পথের সন্ধান বলে দিয়েছেন, কিন্তু তারা সেই পথে চলছে কি? যেসব কাজ মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে, আল্লাহ্‌ তাআলা তা এক এক করে বলে দিয়েছেন, কিন্তু মুসলমান কি সেসব কাজ ত্যাগ করেছে? এ প্রশ্নগুলোর কি উত্তর হতে পারে?

কাফের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্য বান্দা যাদেরকে মনে করি, তারা আমাদের ওপর সকল ক্ষেত্রে বিজয়ী কেন? আমাদের ও কাফেরদের মাঝে বর্তমানে শুধু নামেই পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। কেননা আমরা জানি যে, কুরআন আল্লাহ্‌ তাআলার কিতাব, অথচ আমরা কি এর সাথে কাফেরের ন্যায়ই ব্যবহার করছি না ? আমরা জানি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী, অথচ তাঁর অনুসরণ করা আমরা কাফেরদের মতই ত্যাগ করেছি। আমরা জানি যে, কুরআন হল মুসলিম তথা মানব জাতির একমাত্র সংবিধান। কিন্তু আমরা মানুষের দ্বারা

লিখিত সংবিধান দ্বারা সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা করছি। আমরা জানি রাসূল (সাঃ) আনীত শরীয়ত মুতাবেক বিচার ফায়সালা করতে হবে। মানুষের তৈরি করা আইনের (তাগুতের আইন) কাছে বিচার-ফায়সালা চাওয়া আলাহ্‌র সাথে শিরক হওয়া সত্ত্বেও কুফর কোর্টে বিচার ফায়সালার জন্য যাচ্ছি। মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার হুকুম দলাদলি না করে সর্বাবস্থায় (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র থাকুক বা না থাকুক) মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেককে একজন খলিফার বা আমীরুল মু'মিনীনের নেতৃত্বে একত্রিত থাকা। অথচ আমরা জাতীয়তাবাদ, দেশ, ভাষা, বর্ণে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মাঝে দলাদলি করে শত শত ভাগে বিভক্ত রয়েছি। মিথ্যাবাদীর প্রতি আল্লাহ্‌ তাআলা লানত করেছেন এবং ঘুষখোরদের ও ঘুষদাতা উভয় নিশ্চিতরূপে দোযখে যাবে বলে ঘোষণা করেছেন, সুদখোর ও সুদদাতাকে জগন্য পাপী বলে অভিহিত করেছেন। চোগলখুরী ও গীবতকারীকে আপন ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন, অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতার জন্য কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু এ সমস্ত কথা জানার পরও আমরা কাফেরদের মতই বেপরোয়াভাবে এসব কাজ করে যাচ্ছি। মনে হয়, যেন আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় বিন্দু মাত্র নেই। এ জন্য কাফেরদের তুলনায় আমরা কিছুটা মুসলমান হয়ে থাকলেও আমাদের জীবনে তার কোন প্রতিফলন আমরা পাচ্ছি না। বরং কেবল শাস্তিই পাচ্ছি নানাভাবে এবং নানাদিক দিয়ে। আমাদের ওপর কাফেরদের জয়লাভ এবং সর্বত্র আমাদের পরাজয় ও অপরাধের শাস্তি।

আল্লাহর কালাম মানুষের কাছে এ জন্য আসেনি যে, এটা পেয়েও সে দুর্ভাগ্য ও দুঃখ-মুসিবতের মধ্যে পড়ে থাকবে। পবিত্র কুরআন তো সৌভাগ্য ও সার্থকতা লাভ করার একমাত্র উৎস; আল্লাহ্‌ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেনঃ

طه مانــزلنا علــيك القران لتــشقى (طه : ١–٢)

"ত্ব-হা হে নবী! তোমার প্রতি কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, এটা সত্ত্বেও তুমি হতভাগ্য হয়ে থাকবে।" (সূরা ত্ব-হাঃ ১-২)

কোন জাতির কাছে আল্লাহ্‌ কালাম বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তার লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হওয়া, পরের অধীন থাক, অপমানিত ও পদদলিত হওয়া এবং পরের দ্বারা জন্তু-জানোয়ারের মত বিতাড়িত ও নির্যাতিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এমন দুঃখপূর্ণ অবস্থা সেই জাতির ঠিক তখনই হতে পারে যখন তারা আল্লাহ্‌র কালামের ওপর যুলুম করতে শুরু করে। বনী ইসরাঈলের অবস্থা আপনাদের অজানা নয়। তাদের প্রতি তাওরাত ও ইনজিল নাযিল করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল ঃ

"তাওরাত, ইনজিল এবং অন্যান্য যেসব কিতাব তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল, তারা যদি তা অনুসরণ করে চলতো, তবে তাদের প্রতি আকাশ হতে রিযিক বর্ষিত হতো এবং যমীন হতে খাদ্যদ্রব্য ফুটে বের হতো।" (মায়েদা ঃ ৬৬)

কিন্তু তারা আল্লাহ্‌ তাআলার এসব কালামের প্রতি যুলুম করেছিল তার ফলে-

" " লাঞ্ছনা এবং পরমুখাপেক্ষিতা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল

এবং আল্লাহ্‌র গযবে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল, এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্‌র বাণীকে অমান্য করতে শুরু করেছিল, আর পয়গাম্বরগণকে অকারণে হত্যা করেছিল। তাছাড়া আরও কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছিল এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা তারা অতিক্রম করে গিয়েছিল।"(সূরা বাকারা ঃ ৬১)

অতএব, যে জাতি আল্লাহ্‌র কিতাব ধারণ করে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ায় লাঞ্ছিত, পদদলিত এবং পরের অধীন ও পরের তুলনায় শক্তিহীন হয়, নিঃসন্দেহে মনে করবেন যে, তারা নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কালামের ওপর যুলুম করছে।। অতএব, আল্লাহ্‌র এ গযব হতে রেহাই পাওয়ার এছাড়া আর কোন উপায় থাকতে পারে না যে তারা আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি যুলুম করা ত্যাগ করবে এবং ষোলআনা 'হক' আদায় করতে চেষ্টা করবে।

মুসলমান কাকে বলে এবং মুসলিম শব্দের অর্থ কি, একথা প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বপ্রথমেই জেনে নিতে হবে। কারণ মানুষ্যত্ব কাকে বলে এবং মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য কি, তা যদি মানুষের জানা না থাকে, তবে সে জানোয়ারের মত কাজ করতে শুরু করবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ একথা জানতে না পারে যে, মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কেমন করে পার্থক্য করা যায়, তবে সে তো অমুসলমানের মত কাজ-কর্ম করতে শুরু করবে। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানকে এবং মুসলমানের প্রত্যেকটি সন্তানকেই ভাল করে জেনে নিতে হবে যে, সে যে নিজেকে নিজে মুসলমান মনে করে এ মুসলমান হওয়ার অর্থ কি? মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে কি পরিবর্তন ও পার্থক্য হয়ে যায়? তার ওপর কি কর্তব্য ও দায়িত্ব এসে পড়ে? ইসলামের কোন সীমার মধ্যে থাকলে মানুষ মুসলমান থাকতে পারে এবং কোন সীমা অতিক্রম করলেই বা সে মুসলমান হতে খারিজ হয়ে যায়? এসব কথা না জানলে মুখ দিয়ে সে মুসলমানীর যতই দাবী করুক না কেন, তার মুসলমান থাকা সম্ভব নয়।

মুসলিম কাকে বলে

একথাটি ভাল করে বুঝার জন্য সর্ব প্রথম আপনাকে কুফর ও ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করতে অস্বীকার করাকেই 'কুফর' বা কাফেরী বলা হয়; আর কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে চলা এবং আল্লাহ্‌র দেয়া পবিত্র কুরআনের বিপরীত যে নিয়ম, যে আইন এবং যে আদেশই হোক না কেন তা অমান্য করাকেই বলা হয় ইসলাম। ইসলাম এবং 'কুফরের' এ পার্থক্য কুরআন মজীদের নিম্নলিখিত আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে ঃ

"আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের।" **(সূরা মায়েদা ঃ ৪৪)**

আদালত ও ফৌজদারীতে যেসব মোকদ্দমা উপস্থিত হয় কেবল শুধুমাত্র সেই সবের বিচার-ফায়সালা কুরআন-হাদীস অনুসারে করার কথা এখানে বলা

হয়নি। বরং প্রত্যেকটি মানুষ তার জীবনের প্রত্যেকটি কাজের সময় যে ফায়সালা করে সেই ফায়সালার কথাই এখানে বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যাপারেই আপনাদের সামনে এ প্রশ্ন ওঠে যে, এ কাজ করা উচিত কি উচিত নয়, অমুক কাজ এ নিয়মে করবো কি আর কোন নিয়মে করবো? এসময় আপনাদের কাছে সাধারণত দু' প্রকারের নিয়ম এসে উপস্থিত হয়। এক প্রকারের নিয়ম আপনাদেরকে দেখায় আল্লাহ্‌র কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাহ। আর এক প্রকারের নিয়ম উপস্থিত করে আপনদের নফস, বাপ-দাদা হতে চলে আসা নিয়ম-প্রথা অথবা মানব রচিত আইন। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ম বাদ দিয়ে অন্যান্য পন্থা অবলম্বন করে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, প্রকৃতপক্ষে সে কুফরির পথই অবলম্বন করে। যদি সে তার সমস্ত জীবন সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত করে নেয় এবং কোন কাজেই যদি আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ম অনুসরণ না করে তবে সে পুরোপুরিভাবে কাফের। যদি সে কতক কাজে আল্লাহ্‌র হেদায়াত মেনে চলে আর কতকগুলো নিজের নফসের হুকুম মত কিংবা বাপ-দাদার প্রথা মত অথবা মানুষের রচিত আইন অনুযায়ী করে তবে যতখানি আল্লাহ্‌র আইনের বিরুদ্ধাচারণ করবে, সে ঠিক ততখানি কুফরির মধ্যে লিপ্ত হবে। এ হিসেবে কেউ অর্ধেক কাফের কেউ চার ভাগের এক ভাগ কাফের। মোটকথা, আল্লাহ্‌র আইনের যতখানি বিরোধিতা করা হবে ততখানি কুফরী করা হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা কি আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করতে চাও? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিস ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁরই আনুগত্য করে যাচ্ছে। আর সকলেই তাঁর কাছে ফিরে যাবে।"(আলে ইমরান ঃ ৮৩)

আল্লাহর ইবাদতের অর্থ কেবল এটাই নয় যে, দিন-রাত পাঁচবার তাঁর সামনে সিজদা করলেই ইবাদতের যাবতীয় দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়ে যাবে। বরং দিন-রাত সর্বক্ষণ একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার হুকুম পালন করে চলাকেই প্রকৃতপক্ষে ইবাদত বলে। যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তা হতে ফিরে থাকা এবং তিনি যা করতে আদেশ করেছেন তা পূর্ণরূপে পালন করাই হচ্ছে ইবাদত। কারণ হুকুম দেয়ার ক্ষমতা তো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার, **"আলাহর হুকুম ছাড়া মানুষ অন্য কারো হুকুম মানতে পারে না।"** মানুষের ইবাদত-বন্দেগী তো কেবল তিনিই পেতে পারেন, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার অনুগ্রহে মানুষ বেঁচে আছে। আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই তাঁর হুকুম পালন করে চলছে। একটি পাথর অন্য পাথরের হুকুম মত কাজ করে না, একটি গাছ আর একটি গাছের আনুগত্য করে না, কোন পশু অন্য পশুর হুকুমদারী করে চলে না। কিন্তু মানুষ কি পশু, গাছ ও পাথর অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা তো শুধু আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে, আর মানুষ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য মানুষের নির্দেশ মত চলতে শুরু করবে? একথাই কুরআনের উপরে উল্লেখিত দুইটি আয়াতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। মুসলমানের সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছেঃ

"ঐ ব্যক্তির কথা হইতে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নিজে নেক আমল করে ও বলে যে, নিশ্চয় আমি মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন"। (হা-মিম সিজদাহ ঃ ৩৩)

মুসলিমের বৈশিষ্ট্য

'মুসলিম' তাকেই বলে যে আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ মেনে চলে এবং তার আদেশ লংঘন করে না। আমাদের ৭০% অথবা ৯৫% মুসলিম হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আমাকে ১০০% মুসলিম হতে হবে অর্থাৎ 'আল ইসলাম' কে ১০০% মেনে নিয়ে নিজেকে পেশ করতে হবে। তবে হ্যাঁ হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমলের ক্ষেত্রে কমবেশী ভুলভ্রান্তি হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ শয়তান ও তার সঙ্গী সাথীরা আমাদের পিছনে লেগে আছে সর্বক্ষণ। এরশাদ হচ্ছেঃ

"হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে– যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিস্কৃত করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তাহার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাহদের অভিভাবক করিয়াছি।" (সূরা আরাফ-২৭)

সে (শয়তান) বলল **"আপনি আমাকে যেমন গোমরাহীতে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, আমিও এখন আপনার সত্য সরল পথে এই লোকদের জন্য ওৎ পাতিয়া থাকবো এর পর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।"** (আল-আরাফ ঃ ১৬-১৭)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনে, সেই মহান আল্লাহর শপথ, যিনি শয়তানের ষড়যন্ত্রকে কুমন্ত্রনার পর্যায়েয় সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। (আবু দাউদ)

শয়তানের ফাঁদে পরে মুসলিমের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবার মাধ্যমে ক্ষমারও ব্যবস্থা রেখেছেন।

"তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্যে ক্ষমাশীল। (বনী ইসরাঈল ঃ ২৫)

"তিনিই তাঁহার বান্দাহগণের নিকট হইতে তওবা কবুল করেন এবং গুনাহ সমূহ ক্ষমা ও মার্জনা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত।" (আশ- শুরা ঃ ২৫)

কিন্তু একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হতে হবে **'ছামিনা-ওয়া আত্বানা" শুনলাম এবং মানলাম (HEAR & OBEY)** অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহর (সহীহ হাদীস) সামনে পরিপূর্ণ আত্মসমপর্ণ করতে হবে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

"রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি (ছামিনা-ওয়া আত্বানা)। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (বাকারাহ ঃ ২৮৫)

"যখন মুমিনদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা একথাই বলে ঃ আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম মূলতঃ তারাই সফল কাম।" (আন নূরঃ ৫১)

"যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে। ইহারাই সেই লোক যাহাদিগকে আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন। এবং উহারাই বোধ শক্তি সম্পন্ন।" (আয যুমার ঃ ১৮)

সাহাবা (রাঃ) [রাসূল (সাঃ)-এর সাথীগণ] কিভাবে মুসলিম হয়েছিলেন

আপনারা হয়তো শুনেছেন যে, আরব দেশে মদ পান করার প্রথা খুব বেশী প্রচলিত ছিল। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই মদের জন্য একেবারে পাগল প্রায় ছিল। আসলে মদের প্রতি তাদের অন্তরে গভীর আকর্ষণ বর্তমান ছিল। এর প্রশংসা করে কত যে গযল-গীত তারা রচনা করেছিল, তার হিসেব নেই। মদের জন্য প্রাণ দিতেও তারা প্রস্তুত হতো। একথাও আপনারা জানেন যে, একবার মদের নেশা লাগলে তা দূর হওয়া বড়ই মুশকিল। মদখোর ব্যক্তিরা মদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু মদ ত্যাগ করতে পারে না। কোন মদখোর যদি মদ না পায় তবে তার অবস্থা কঠিন রোগীর অপেক্ষাও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু যখন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন কি অবস্থা হয়েছিল তা কি আপনারা কখনও শুনেছেন? মদের জন্য পাগল জান দিতে প্রস্তুত সেই আরবরাই এ হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে নিজেদের হাতেই মদের বড় বড় পাত্র ভেংগে ফেলেছিল। মদীনার অলিতে-গলিতে বৃষ্টির পানির মত মদ বয়ে গিয়েছিল।

হযরত আবু বুরাইদা (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আমরা একটা মদের আসরে বসাছিলাম, হঠাৎ আমি উঠে রওয়ানা হলাম এবং রসূলুলাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। ইতিমধ্যে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশ এসে গেছে। আমি আমার সংগীদের কাছে ফিরে এলাম এবং তাদের সামনে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আয়াত (মায়েদা ঃ ৯০,৯১) 'ফাহাল আনতুম মুনতাহুন' পর্যন্ত পাঠ করে শুনালাম। তখন কতিপয় লোকের হাতে পানপাত্র ছিল, যা থেকে তারা কিছু পান করেছে এবং কিছু বাকী আছে। নির্দেশ শুনার সাথে সাথে সবাই

পানপাত্র উপুর করে দিলেন এবং বারবার বলতে থাকলেন, **'ইনতাহাইনা রব্বানা' 'ইনতাহাইনা রবান্না'–** "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিরত হলাম"- (তাসীরে ইবনে কাসীর)

"লোকদের ভয় দেখানোর জন্য কোন সংস্থা কায়েম করারও প্রয়োজন হল না, আর সরকারকেও মৃত্যুদণ্ড, কয়েদ অথবা মালক্রোক করতে হল না। বরং লোকেরা কুরআনের নির্দেশ শুনার সাথে সাথে স্বেচ্ছায় তা মেনে নিল।" (মিনহাজুল কুরআন ফিত-তারবিয়াহ, মুহাম্মাদ শাদীদ)।

সাফিয়্যা বিনতে শাইবা বলেন, একদা আমরা আয়েশা (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরাইশ মহিলাগণ এবং তাদের গুণকীর্তন উল্লেখিত হল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, কুরাইশ মহিলাদের সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! আনসার মহিলাদের তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারিণী এবং কুরআন মজীদের সত্যতা স্বীকার ও তার উপর ঈমানদার নারী আমি আর দেখিনি। যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলঃ

এবং নিজেদের বক্ষদেশের উপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে- (নুরঃ ৩১) তখন তাদের পুরুষ লোকেরা বাড়ি ফিরে গিয়ে নারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ এই আয়াত নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, বোন এবং অপরাপর আত্মীয়া মহিলাদের শুনালেন। এই নির্দেশ শুনার সাথে সাথে প্রতিটি মহিলা উঠে গিয়ে চাদর দিয়ে নিজেদের মাথা ঢেকে নিল। (আবু দাউদ)

শেখ মুহাম্মদ আলী আল রিফাই সাহাবাদের (রাঃ) সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন সাহাবারা (রাঃ) আল্লাহর হুকুমের অনুসরণের জন্য নিজেদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরবানী দিয়েছেন। কুরবানী দিতে দিতে উনারা ইসলাম যে উচ্চ আসনে রয়েছে সেই আসনে অসীন হয়েছিলেন। আর বর্তমান দিনের মুসলমান দাবীদাররা নিজেদের জীবনের কুরবাণী করার কথা তো অনেক দূরে, ইসলামকে কুরবানী দিতে দিতে নিজেদের মানে নামিয়ে আনতে তৎপর। আর এ কাজে তাদের সহযোগী হচ্ছে বর্তমান কালের আলেম নামধারী একদল 'মাগদুবের' দল।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাকে হুকুম করেছেন আমি নিজে যেন সর্বপ্রথম মুসলিম হওয়ার ঘোষণা দেই ঃ

আপনি বলে দিন ঃ "আমাকে তো এই আদেশই করা হয়েছে যে, সকলের আগে আমি তাহার সম্মুখে মাথা নত করিয়া দিব। আমাকে তাকীদ করা হয়েছে যে, (কেহ যদি ইলাহর সাথে শরীক করে তবে সে করুক কিন্তু) তুমি কিছুতেই মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না।" (সূরা আল-আনাম ঃ ১৪)

ইবাদত

'ইবাদাত' শব্দটির সাথে আমরা খুবই পরিচিত। এ শব্দটি সর্বসাধারণ মুসলমান প্রায়ই বলে থাকে, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ অনেকেই জানে না। আলাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন ঃ

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (الذريت : ٥٦)

"আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল আমারই ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"- (সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

এ থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা গেল যে, মানুষের জন্ম, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আল্লাহ্‌ তাআলার ইবাদাত এবং বন্দেগী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ শব্দটির অর্থ না জানলে যে মহান উদ্দেশ্যে আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আপনি কিছুতেই লাভ করতে পারেন না। চিকিৎসক রোগীকে নিরাময় করতে না পারলে বলা হয় যে, সে চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি আপনারা যদি আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য লাভ অর্থাৎ ইবাদাত করতে না পারেন তবে বলতে হবে আপনাদের জীবন ব্যর্থ হয়েছে। এজন্যই এ 'ইবাদাত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য জেনে নেয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

ইবাদত শব্দের অর্থ হুকুমের অনুসরণ করা - রমযান মাসে রোজা রাখাটা যেমন একটি ইবাদত অর্থাৎ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তায়ালার হুকুম তেমনি ঈদের দিনগুলিতে রোযা না রাখাটাই ইবাদত অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুম। আরবী ভাষায় ইবাদতের আসল অর্থ বাধ্য হওয়া, অনুগত হওয়া, কারো সামনে এমনভাবে আত্মসমর্পণ করা যেন উনার মোকাবেলায় কোন প্রতিরোধ অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা না হয়। তিনি তাঁর (যার ইবাদত করা হয়) মর্জী মতো যেভাবে খুশী সেবা গ্রহন করতে পারেন কাজে লাগাতে পারেন।

ইবাদাত শব্দটি আরবী 'আবদ' (عبد) হতে উদ্ভুত হয়েছে। 'আবদ' অর্থ দাস ও গোলাম। অতএব 'ইবাদাত' শব্দের অর্থ হবে বন্দেগী ও গোলামী করা। যে ব্যক্তি অন্যের দাস সে যদি মনিবের নিকটে একান্ত অনুগত হয়ে থাকে এবং তার সাথে ঠিক ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করে, তবে একে বলা হয় বন্দেগী ও ইবাদাত। পক্ষান্তরে কেউ যদি কারো চাকর হয় এবং মনিবের কাছ থেকে পুরোপুরি বেতন আদায় করে, কিন্তু তবুও সে যদি ঠিক চাকরের ন্যায় কাজ না করে তবে বলতে হবে যে, সে নাফরমানী ও বিদ্রোহ করছে। আসলে একে অকৃতজ্ঞতা বলাই বাঞ্ছনীয়। তাই সর্বপ্রথম আপনাকে জানতে হবে, মনিবের সামনে 'চাকরের' ন্যায় কাজ করা এবং তার সমীপে আনুগত্য প্রকাশ করার উপায় কি হতে পারে।

প্রথমত ঃ বান্দাহ বা চাকরকে প্রথমে মনিবকে 'প্রভু' বলে স্বীকার করতে হবে এবং মানতে হবে যে, যিনি আমার মালিক, যিনি আমাকে দৈনন্দিন রুজী দান করেন এবং যিনি আমার হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন তাঁরই অনুগত হওয়া আমার কর্তব্য। তিনি ছাড়া অন্য কারো আমি আনুগত্য করবো না।

দ্বিতীয়তঃ সকল সময় মনিবের আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম পালন করা, মনিবের বিরুদ্ধে মনে কোন কথার স্থান না দেয়া এবং অন্য কারো কথা পালন না করাই বান্দাহর দ্বিতীয় কর্তব্য। গোলাম সবসময়ই গোলাম; তার একথা বলার কোন অধিকার নেই যে, আমি মনিবের এ আদেশ মানবো আর অমুক আদেশ মানবো না। কিংবা আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মনিবের গোলাম আর অন্যান্য সময় আমি তার গোলামী হতে সম্পূর্ণ আযাদ ও মুক্ত।

তৃতীয়ত ঃ মনিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার সমীপে আদব রক্ষা করে চলা বান্দার তৃতীয় কাজ। আদব ও সম্মান প্রকাশের যে পন্থা মনিব নির্দিষ্ট করে দেবেন তাই অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

এ তিনটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে যে কার্যটি সম্পন্ন হয় আরবী পরিভাষায় তাকেই বলে ‘ইবাদাত’। আল্লাহ্ সুবহানু ওয়া তাআলা বলেছেন ঃ

“আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল আমারই ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।” (আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

এর প্রকৃত মর্ম হচ্ছে ঃ আল্লাহ্ তাআলা জ্বিন ও মানব জাতিকে একমাত্র এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, (১) তারা কেবল আল্লাহ্ তাআলারই দাসত্ব করবে, অন্য কারো নয়, (২) কেবল আল্লাহ্র হুকুম পালন করবে, এছাড়া অন্য কারো হুকুম অনুসরণ করবে না এবং (৩) কেবল তাঁরই সামনে সম্মান প্রকাশের জন্য মাথা নত করবে, অন্য কারো সামনে নয়। এ তিনটি জিনিসকে আল্লাহ্ তাআলা বুঝিয়েছেন এ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ‘ইবাদাত’ দ্বারা। যেসব আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইবাদাতের নির্দেশ দিয়েছেন তার অর্থ এটাই। আমাদের শেষ নবী এবং তাঁর পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের যাবতীয় শিক্ষার সারকথা হচ্ছে ঃ الا تعبدوا الا اياه **“আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত বা হুকুমের অনুসরণ করো না”** অর্থাৎ দাসত্ব ও আনুগত্য লাভের যোগ্য সারা জাহানে একজনই মাত্র বাদশাহ আছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা; অনুসরণযোগ্য মাত্র একটি বিধান বা আইন আছে, তাহলো আল্লাহ্র দেয়া জীবনব্যবস্থা এবং একটি মাত্র সত্তাই আছে, যার পূজা-উপাসনা, আরাধনা করা যেতে পারে। আর সেই সত্তাই হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এরশাদ হচ্ছে ঃ

“আমি আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য (ইলাহ) নেই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।” (আল-অম্বিয়া ঃ ২৫)

মনিব ও চাকরের তিন প্রকার উদাহরণ ঃ

(ক) একটি চাকর যদি মনিবের নির্ধারিত কর্তব্য পালন না করে বরং তাঁর সামনে কেবল হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, লক্ষ বার কেবল তার নাম জপে, তবে এ চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? মনিব তাকে অন্যান্য মানুষের প্রাপ্য আদায় করতে বলেন। কিন্তু সে কেবল সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে মনিবের সামনে মাথা নত করে দশবার সালাম করে এবং আবার হাত বেঁধে দাঁড়ায়।

মনিব তাকে অনিষ্টকর কাজগুলো বন্ধ করতে আদেশ করেন। কিন্তু সে সেখান থেকে একটুও নড়ে না। বরং সে কেবল সিজদাহ করতে থাকে। মনিব তাকে চোরের হাত কাটতে বলেন। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে থেকে সুললিত কণ্ঠে বিশবার পড়তে বা উচ্চারণ করতে থাকে– ‘চোরের হাত কাট’ কিন্তু সে একবারও এমন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে না যার অধীন চোরের হাত কাটা সম্ভব হবে। আপনি কি বলতে পারেন যে, সে প্রকৃতপক্ষে মনিবের বন্দেগী ও ইবাদাত করছে? আপনার কোন চাকর এরূপ করলে আপনি তাকে কি বলবেন ? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহ্র যে চাকর এরূপ আচরণ করে তাকে আপনি ‘বড় আবেদ’ (ইবাদাতকারী, বুযুর্গ ইত্যাদি) নামে অভিহিত করেন। এরা সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলার কত শত হুকুম পাঠ করে কিন্তু সেগুলো পালন করার এবং কাজে পরিণত করার জন্য একটু চেষ্টাও করে না। বরং কেবল নফলের পর নফল পড়তে থাকে, আল্লাহ্র নামে হাজার দানা তাসবীহ জপতে থাকে এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতে থাকে। আপনি বিস্মিত হয়ে বলেনঃ ‘ওহে! লোকটা কত বড় আবেদ আর কত বড় পরহেযগার।’ আপনাদের এ ভুল ধারণার মূল কারণ এই যে, আপনারা ‘ইবাদত’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ মোটেই জানেন না।

(খ) আর একজন চাকরের কথা ধরুন। সে রাত-দিন কেবল পরের কাজ করে, অন্যের আদেশ শুনে এবং পালন করে, অন্যের আইন মেনে চলে এবং তার প্রকৃত মনিবের যত আদেশ ও ফরমানই হোক না কেন, তার বিরোধিতা করে। কিন্তু ‘সালাম’ দেয়ার সময় সে তার প্রকৃত মনিবের সামনে উপস্থিত হয় এবং মুখে কেবল তার নাম জপতে থাকে। আপনাদের কারো কোন চাকর এরূপ করলে আপনারা কি করবেন? তার ‘সালাম’ কি তার মুখের ওপর নিক্ষেপ করবেন না? মুখে মুখে সে যখন আপনাকে মনিব আর মালিক বলে ডাকবে তখন আপনি কি তাকে একথা বলবেন না যে, তুই ডাহা মিথ্যাবাদী ও বেঈমান; তুই আমার বেতন খেয়ে অন্যের তাবেদারী করিস, মুখে আমাকে মনিব বলে ডাকিস, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেবল অন্যেরই কাজ করে বেড়াস? এটা নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধির কথা এটা কারো বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা! যারা রাত-দিন আল্লাহ্র আইন ভঙ্গ করে, কাফের ও মুশরিকের আদেশ অনুযায়ী নিজেদের বাস্তব কর্মজীবনে কাজ করে এবং নিজেদের বাস্তব কর্মজীবনে আল্লাহ্র বিধানের কোন পরোয়া করে না; তাদের নামায-রোযা, তাসবীহ পাঠ, কুরআন তেলাওয়াত, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আপনি ইবাদাত বলে মনে করেন। এ ভুল ধারণারও মূল কারণ ইবাদাত শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানা।

(গ) আর একটি চাকরের উদাহরণ নিন। মনিব তার চাকরদের জন্য যে ধরনের পোশাক নির্দিষ্ট করেছেন, মাপ-জোখ ঠিক রেখে সে ঠিক সেই ধরনের পোশাক পরিধান করে, বড় আদব ও যত্ন সহকারে সে মনিবের সামনে হাজির হয়, প্রত্যেকটি হুকুম শুনামাত্রই মাথা নত করে শিরোধার্য করে নেয় যেন তার তুলনায় বেশী অনুগত চাকর আর কেউই নয়। ‘সালাম’ দেয়ার সময় সে

একেবারে সকলের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং মনিবের নাম জপবার ব্যাপারে সমস্ত চাকরের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিষ্ঠা প্রমাণ করে; কিন্তু অন্যদিকে এ ব্যক্তি মনিবের দুশমন এবং বিদ্রোহীদের খেদমত করে, মনিবের বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে এবং মনিবের নাম পর্যন্ত দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তারা যে চেষ্টাই করে, এ হতভাগা তার সহযোগিতা করে; রাতের অন্ধকারে সে মনিবের ঘরে সিঁদ কাটে এবং ভোর হলে বড় অনুগত চাকরটির ন্যায় হাত বেঁধে মনিবের সামনে হাজির হয়। এ চাকরটি সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? আপনি নিশ্চয়ই তাকে মুনাফিক, বিদ্রোহী ও নিমকহারাম প্রভৃতি নামে অভিহিত করতে একটুও কুণ্ঠিত হবেন না। কিন্তু আল্লাহ্‌র কোন চাকর যখন এ ধরনের হাস্যকর আচরণ করতে থাকে তখন তাকে আপনারা কি বলতে থাকেন? তখন আপনারা কাউকে 'পীর সাহেব, কাউকে 'হযরত মাওলানা, কাউকে বড় কামেল, পরহেযগার প্রভৃতি নামে ভূষিত করেন। এর কারণ এই যে, আপনারা তাদের মুখে মাপ মত লম্বা দাড়ি দেখে, তাদের পায়জামা পায়ের গিরার দু'ইঞ্চি ওপরে দেখে, তাদের কপালে নামাযের কালো দাগ দেখে এবং তাদের লম্বা লম্বা নামায ও মোটা মোটা দানার তাসবীহ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন; এদেরকে বড় দ্বীনদার ও ইবাদাতকারী বলে মনে করেন। এ ভুল শুধু এজন্য যে, 'ইবাদাত' ও দ্বীনদারীর ভুল অর্থই আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে।

ইবাদতের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি বিষয়

ক) ইলমুত তাওহীদ (তাওহীদের জ্ঞান) এবং খ) আমালুত তাওহীদ (তাওহীদের আমল)।

(ক) ইলমুত তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞান) ঃ

তাওহীদ শব্দের অর্থ এককীকরণ। কোন জিনিসকে এক করা। আকীদার দৃষ্টিতে তাওহীদ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে তাঁকে একক ও নিরঙ্কুশ মর্যাদা দেয়া। যেমন তিনিই শুধু স্রষ্ঠা আর কেউ নয়। তিনিই একমাত্র রব আর কেউ নয়। উপকার করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। বিপদ-সঙ্কট থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা তিনি ছাড়া আর কারো নেই। ইবাদত পাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর। ভয় করতে হবে শুধু তাঁকেই। নির্ভর করতে হবে শুধু তাঁরই উপর। এভাবে আল্লাহ্‌কে একক সত্ত্বা ও ক্ষমতাবান হিসেবে বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে তাওহীদ। তাওহীদ বা একত্ববাদের বিপরীত বিষয়ই হচ্ছে শিরক বা শরীক করা। আলাহ্‌র তাআলার সাথে শিরক করে তওবা ছাড়া মৃত্যুবরণকারীর জন্য জান্নাত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র কোরআনে পাকে।

তাওহীদের প্রকারভেদ ঃ শেখ মুহাম্মদ আলী আল রিফাই তাওহীদের প্রকারভেদের আলোচনায় বলেন তাওহীদকে চার ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যথাঃ ১) তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ, ২) তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ, ৩) তাওহীদ আল আসমাউস সিফাত, ৪) তাওহীদ আল-হাকীমিয়াহ।

(১) তাওহীদ আর-রুবুবিয়াহ্‌ ঃ আলাহ্‌ই একমাত্র রব। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, তিনি একমাত্র অনন্তকাল থাকবেন। তিনি একমাত্র অদৃশ্য ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন (আলেমুল গায়েব)। তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা ও নিরাপত্তাদানকারী। তিনিই জীবন-মৃত্যুর মালিক। তিনিই মাতৃগর্ভে শিশুর প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত। তিনিই জানেন কখন বৃষ্টি হবে। তিনিই জানেন মানুষ আগামীকাল কি উপার্জন করবে। তিনিই সবার মৃত্যুর সময় ও স্থান নির্ধারণকারী। আল্লাহ্‌র এই গুণাগুণসমূহ সামগ্রিকভাবে 'তাওহীদ আল-রুবুবিয়াহ্‌র' অন্তর্গত।

যদি কেউ এই ধারনা পোষণ করে যে আমেরিকা বা জাতিসংঘ (ইউ, এন) তার নিরাপত্তা বিধান করবে অথবা তার ব্যবসা বা তার মনিব বা সরকার তাকে রিযিক দিবে, জ্যোতিষ বা ভাগ্যগণনাকারী তার ভবিষ্যত বলে দিবে; তাহলে সে "তাওহীদ আল-রুবুবিয়াহকে' অস্বীকার করল।

(২) তাওহীদ আল-উলুহিয়াহ ঃ একমাত্র আলাহ্‌ সুবহানাহু তা'য়ালা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা (হুকুমের অনুসরণ) যাবে না। সকল ইবাদত (যেমন- নামায, রোযা, কোরবানী বা ত্যাগ) কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

যদি কেউ কোন পূণ্যর্বান মৃত ব্যক্তি বা কবরের (মাজার) কাছে অথবা কোন ধর্মীয় নেতার (পীর, ফকির) কাছে তার মনের আকাঙ্খা পুরণের জন্য প্রার্থনা করে এবং তাদের নিকট সওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করে তবে সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অস্বীকার করলো। যা একটি প্রকাশ্য কুফরী এবং 'তাওহীদ আল উলুহিয়ার' পরিপন্থী।

(৩) তাওহীদ আল-আসমাউস সিফাত ঃ আমরা জানি যে, আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি সুন্দর নাম রয়েছে যার প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে আলাহ্‌র গুণ-সমূহকে প্রকাশ করে। এই গুণবাচক নামসমূহের প্রত্যেকটির উপর ঈমান আনা ফরয। এই নামসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনই 'তাওহীদ আল-আসমাউস সিফাত' যেমন আর রহমানক (একমাত্র দয়াবান) শুধু আল্লাহ তায়ালাই

(৪) তাওহীদ আল হাকিমিয়াহ ঃ আলাহই একমাত্র আইনদাতা এবং এই বিশ্বজগতে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ আইন প্রণয়ণের অধিকার রাখে না। অন্য কথায়, ব্যক্তিজীবন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবী একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হতে হবে। যদি আমরা মনে করি যে, আল্লাহ্‌র আইন (শরীয়াহ) যা রাসূল (সাঃ) ও খিলাফায়ে রাশেদার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সেকেলে, অপ্রয়োজনীয়, নিকৃষ্ট এবং আল্লাহ্‌র আইনের (শরীয়াহ) তুলনায় ব্রিটিশ বা আমেরিকান আইন বা অন্য যে কোন মতাদর্শ বা জীবনব্যবস্থা (যেমন-গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ ইত্যাদি) এগুলির যে কোনটি যদি বর্তমান প্রেক্ষাপটে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে

মনে হয় তাহলে এই ধারণা পোষণকারী ব্যক্তির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ঘোষণা কার্যকর হবে না। এই ধারণাই কুফরী এবং **'তাওহীদ আল হাকিমিয়াহর"** প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন।

তাওহীদের গুরুত্ব ও মর্যাদা

আল্লাহর চিরন্তন শাশ্বত দ্বীন-ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। তাওহীদের দিকে ডাকার জন্যই আল্লাহ্ যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের সকলকে আল্লাহ্ একই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আর তা হচ্ছে তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর বিরোধী সব কিছুকে বর্জন করে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের দিকে আহবান জানানো। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

"আমি সকল জাতির কাছে রাসুল পাঠিয়েছি। তারা সবাই নিজ নিজ জাতিকে এ বলে আহবান জানিয়েছেন, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।" (নাহল ঃ ৩৬)

উক্ত আয়াতে তাগুতকে বর্জন ও আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদতের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই হচ্ছে তাওহীদ। তাওহীদের স্বীকৃতি ছাড়া কেউ মুসলমান হতে পারেনা। তাওহীদ ছাড়া কোন আমল আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই রাসূলের উত্তরসুরীগণ মানুষকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দিকে আহবান জানাবে। তাওহীদ গ্রহণ করলে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আমলের দিকে আহবান জানাবে।

হযরত মুআজকে রাসূল (সাঃ) ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠানোর সময় তাঁকে এভাবে নসিয়ত দেনঃ "তাদের তুমি প্রথম যে বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিবে তাহলো তারা যেন আল্লাহ্কে (ইলাহ হিসেবে) একক মর্যাদা দেয় যদি তারা এ বিষয়টি স্বীকার করে নেয়, তার পর তাদেরকে জানাবে যে আল্লাহ্ দিনে ও রাতে পাঁচবার নামায ফরজ করেছেন।' (বুখারী)

একজন মুসলমান তাওহীদের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করে আর তাওহীদ নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়। এভাবে যে মুসলমানের শুরু ও শেষ হবে তাওহীদ, সে জান্নাতে যাবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ 'যার শেষ কথা হবে আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

(হাকেম, ইরওয়াউর গালীল-আলবানী)।

আল্লাহ আমাদের রব ও ইলাহ। আমরা তাঁর বান্দা ও দাস। বান্দার উপর যেমন আল্লাহ্র হক আছে। তেমনি আল্লাহ্র উপরও বান্দার হক রয়েছে। উভয় পক্ষের হক সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেনঃ "তুমি কি জান বান্দার উপর আল্লাহ্র হক এবং আল্লাহ্র উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'বান্দার উপর আল্লাহ্র হক হচ্ছে শুধু মাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে

না। আর আল্লাহ্র উপর বান্দার হক হচ্ছে যে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না তাকে শাস্তি না দেয়া।' (বুখারী ও মুসলিম)

(খ) আমালুত তাওহীদ (তাওহীদের আমল) ঃ

ইহা দুইভাবে বিভক্ত- (১) ইবাদত (ব্যক্তিগত উপাসনা) ও (২) মুয়ামালাত

(১) ইবাদাত ঃ বান্দা এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ইবাদত। এই ইবাদতের উদ্দেশ্য শুধু একটাই আর তা হলো শুধুমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কে সন্তুষ্ট করা।

উদাহরণ ঃ পাক পবিত্রতা, সালাত (নামায) সওম (রোজা), হজ্জ ইত্যাদি। [এই ইবাদতের ব্যাপারে কোন ইজতিহাদ করা যাবে না শুধুমাত্র ইজতিহাদ বায়ানি বর্ণনা সংক্রান্ত ইজতিহাদ। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই। সালাত পড়ার (ফরজ ওয়াজিব অংশ ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্য) বর্ণনা সংক্রান্ত কিছুটা মতপার্থক্য থাকতে পারে।]

(২) মুয়ামালাত Muamalat (Transactions) বান্দা এবং সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক সংক্রান্ত ইবাদতকে অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুম আহকাম গুলিকে মুয়ামালাত বলে। এখানে আল্লাহ্র ইবাদত সম্পন্ন হয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র হালাল হারাম ও শরয়ী হুকুম মানার মাধ্যমে।

উদাহরণ ঃ বেচা কেনা (Sales), নিকাহ (বিবাহ), তালাক, হুদুদ আলাহ্র আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা, ইসলামী শিক্ষা ইত্যাদি।

সমাজের বিধান সমূহ (Systems of society) ঃ

১) নিজামুল হুকুম (Nizamul hukum) (Ruling system of Islam) [ইসলামী শাসন ব্যবস্থা]

২) নিজামুল ক্বাদা (Nizamul Qadaa) (Systems of Judgement) [ইসলামী বিচার ব্যবস্থা]

৩) নিজামুল ইকতিসাদ (Nizamul Iqtisaad) (Systems of Economic) [ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা]

৪) নিজামুল ইজতিমা (Nizamul Ijtimaa) (Social System) [ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা]

৫) নিজামুল জিহাদ ওয়া শিয়ার (Nizamul Jihad wa Siyar) (Forieng Policy of Islam) [ইসলামী বিদেশনীতি]

৬) নিজামুল উকুবাত (Nizamul Uqobat) (Punishement) [ইসলামী শাস্তি ব্যবস্থা বা হুদুদ।]

৭) নিজামুল তালিম/তারবিয়া (Nizamul Taleem/Tarbeah) [ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা]

অতএব উপরের আলোচনা থেকে দেখলাম যে, শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের নামই ইবাদত না। নামায, রোজা, যাকাতের বিষয়ে যেমন কোরআনে অহি রয়েছে তেমনি মুয়ামালাত সম্পর্কিত অর্থাৎ ইসলামী শাসন

ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, অর্থনীতি ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, শাস্তি ব্যবস্থা সম্পর্কিত আয়াত (অহি) আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা কোরআনে নাজিল করেছেন। এ সকল আয়াতকে না মেনে শুধুমাত্র নামায রোজার যাকাত ও হজ্জের আয়াতগুলিকে মান্য করলে ইবাদত পরিপূর্ণ হবে না এবং অন্যান্য এ সকল সামাজিক বিষয়ে আল্লাহ্র হুকুমগুলিকে বাদ দিয়ে কুফর সমাজ ব্যবস্থার (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র মোতাবেক) দেয়া পদ্ধতি সন্তুষ্ট চিত্তে অনুসরণ করার অধিকার আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা আমাদেরকে দেননি। যারা ইবাদতকে শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্জে সীমাবদ্ধ রেখে জীবনের বাকি সকল অংশে মানুষের দেয়া নিয়মের **(Man made laws)** উপর চলে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে তাদের শাস্তি এ ছাড়া কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে?" (বাকারাঃ ৮৫)

অতএব আমাদেরকে পরিপূর্ণ রূপে সকল ক্ষেত্রে ইবাদতের বা আল্লাহর হুকুম সমূহের অনুসরণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা বলেন ঃ **"হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"** (বাকারা ২০৮)

"না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের নামের শপথ, ইহারা কিছুতেই ঈমানদার হইতে পারে না, যতক্ষন না তাহারা তাহাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপার সমূহে তোমাকে বিচারপতি রূপে মানিয়া লইবে। অতঃপর তুমি যাহাই ফায়সালা করিবে সে সম্পর্কে তাহারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিবে না, বরং উহার সম্মুখে নিজদিগকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করিয়া দিবে।" (নিসা ঃ ৬৫)

আপনাকে জানতে এবং বুঝতে হবে যে, চেতনা লাভের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আলাহ্র আইন অনুযায়ী চলা এবং তাঁরই নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করার নামই হচ্ছে আল্লাহ্র ইবাদাত। আপনি একথা বলতে পারেন না যে, আমি অমুক সময় আল্লাহ্র বান্দাহ আর অমুক সময় আল্লাহ্র বান্দাহ নই। এখানে আপনি এ প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে এ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদিকে কি বলা যায়? এগুলি অবশ্যই আপনার উপর আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে হুকুম করা সবচেয়ে জরুরী অবশ্যই পালনীয় ফরজ ইবাদতসমূহ। এ ইবাদাতগুলোকে আপনার ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে এজন্য যে, প্রতি মূহূর্তে ও প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহ্র ইবাদাত (হুকুমের অনুসরণ) করার স্মরণ আপনি এ ইবাদত সমূহের মাধ্যমে লাভ করবেন। নামায আপনাকে দৈনিক পাঁচবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি আলাহ্ তাআলার দাস–

তাঁরই বন্দেগী করা তোমার কর্তব্য; রোযা বছরে একবার পূর্ণ একটি মাস আপনাকে এ বন্দেগী করার জন্যই প্রস্তুত করে, যাকাত আপনাকে বার বার মনে করিয়ে দেয় যে, তুমি যে অর্থ উপার্জন করেছো তা আল্লাহ্র দান, তা কেবল তোমার খেয়াল-খুশী মত ব্যয় করতে পার না। বরং তা দ্বারা তোমার মালিকের হক আদায় করতে হবে। হজ্জ মানব মনে আল্লাহ্ প্রেম ও ভালবাসা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতির এমন চিত্র অঙ্কিত করে যে, একবার তা মুদ্রিত হলে সমগ্র জীবনেও মন হতে তা মুছে যেতে পারে না। এসব বিভিন্ন ইবাদাত আদায় করার পর আপনার জীবনের প্রতিটি সময় এবং কাজ একমাত্র আল্লাহ্র হুকুমের সীমার মধ্যে আনতে পারেন, তবেই আপনার নামায প্রকৃত নামায হবে, রোযা খাঁটি রোযা হবে, যাকাত সত্যিকার যাকাত এবং হজ্জ আসল হজ্জ হবে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ উদ্দেশ্য হাসিল না হলে কেবল রুকু-সিজদাহ, অনাহার-উপবাস, হজ্জের অনুষ্ঠান পালন করা এবং যাকাতের নামে টাকা ব্যয় করলে আপনার কিছুই লাভ হবে না। বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতগুলোকে মানুষের একটি দেহের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এতে প্রাণ থাকলে এবং চলাফিরা বা কাজ-কর্ম করতে পারলে নিঃসন্দেহে তা জীবিত মানুষের দেহ, অন্যথায় তা একটি প্রাণহীন দেহ মাত্র। লাশের চোখ, কান, হাত, পা সবকিছুই বর্তমান থাকে; কিন্তু প্রাণ থাকে না বলেই তাকে আপনারা মাটির গর্তে পুতে রাখেন। তদ্রূপ নামাযের আরকান-আহকাম যদি ঠিকভাবে আদায় করা হয় কিংবা রোযার শর্তাবলী যদি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু হৃদয় মনে আল্লাহ্র ভয়, আল্লাহ্র প্রেম-ভালবাসা এবং তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার ভাবধারা বর্তমান না থাকে– ঠিক যে জন্য এসব আপনার ওপর ফরজ করা হয়েছিল, তবে তাও একটি প্রাণহীন ও অর্থহীন জিনিস হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষ যাদের ইবাদত করে

কুরআন পাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তিন প্রকার গোমরাহ হবার কথা আলোচনা করেছেন অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত (হুকুমের অনুসরণ) বাদ দিয়ে তিন প্রকার ইলাহর ইবাদত করে। যথাঃ

প্রথম পথ হচ্ছে ঃ মানুষের নিজের নফসের খাহেশ

"আল্লাহর দেয়া বিধান পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তি নিজের নফসের ইচ্ছামত চলে তার অপেক্ষা অধিক গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? এ ধরনের যালেম লোকদেরকে আল্লাহ্ কখনই সৎপথের সন্ধান দেন না।" (আল-কাসাস ঃ ৫০)

এর অর্থ এই যে, মানুষকে গোমরাহ করার মত যত জিনিস আছে তার মধ্যে মানুষের নফসই হচ্ছে তার সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টকারী শক্তি। যে ব্যক্তি নিজের খাহেশাতের দাসত্ব করবে, আল্লাহ্র বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান

হবে, যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, কেবল সে কাজই করতে সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করবে। সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ্ নিষেধও করে থাকেন, তবুও সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। আর এসব জিনিস যেসব কাজে পাওয়া যাবে না সেসব কাজ করতে সে কখনও প্রস্তুত হবে না। আল্লাহ্ তাআলা যদি সেই কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবুও সে তার কিছুমাত্র পরোয়া করবে না। এমতাবস্থায় একথা পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, সে আল্লাহ্ তাআলাকে তার ইলাহ রূপে স্বীকার করেনি বরং তার নফসকেই সে তার একমাত্র ইলাহের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। কাজেই এমন ব্যক্তি কোন প্রকারে আল্লাহ্র হেদায়াত লাভ করতে পারে না। কুরআন শরীফে একথা অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে।

"(হে নবী!) যে ব্যক্তি নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, তুমি কি তার সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তুমি কি এ ধরনের মানুষের পাহারাদারী করতে পার? তুমি কি মনে কর যে, এদের মধ্যে অনেক লোকই (তোমার দাওয়াত) শোনে এবং বুঝে? কখনও নয়। এরা তো একেবারে জন্তু-জানোয়ারের মত বরং তা অপেক্ষাও এরা নিকৃষ্ট।"
(আল-ফুরকান ৪৩-৪৪)

যে ব্যক্তি নফসের দাস, সে যে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না। কোন পশুকে আপনারা নির্ধারিত সীমালংঘন করতে দেখবেন না। প্রত্যেক পশু সেই জিনিসই আহার করে এবং ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য খায় যে পরিমাণ আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু এই মানুষ এমনই এক শ্রেণীর পশু যে, সে যখন নফসের দাস হয়ে যায়, তখন সে এমন সব কাজ করে যা দেখে শয়তানও ভয় পেয়ে যায়। মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার এটাই প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় পথ হচ্ছে ঃ বাপ-দাদার রসম-রেওয়াজ

বাপ-দাদা হতে যেসব রসম-রেওয়াজ, যে আকীদা-বিশ্বাস ও মত এবং চাল-চলন ও রীতিনীতি চলে এসেছে তার প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকার দরুন মানুষ তার গোলাম হয়ে যায়। আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষাও তাকে বেশী সম্মানের যোগ্য বলে মনে করে। সেই রসম-রেওয়াজের বিপরীত আল্লাহ্র কোন কোন হুকুম যদি তার সামনে পেশ করা হয়, তবে সে অমনি বলে ওঠে বাপ-দাদারা যা করে গেছে, আমার বংশের যে নিয়ম বহুদিন হতে চলে এসেছে, আমি কি তার বিপরীত কাজ করতে পারি? পূর্ব-পুরুষদের নিয়মের পূজা করার রোগ যার মধ্যে এতখানি, আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা হওয়া তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে তার বাপ-দাদা এবং তার বংশের লোকেরাই তার ইলাহ হয়ে বসে। সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করলে তা যে মিথ্যা দাবী হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বড় কড়াকড়িভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ

"যখনই তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ তাআলার হুকুম পালন করে চল, তখন তারা শুধু একথাই বলে উঠেছে যে, আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে, আমরা কেবল সে পথেই চলবো। কিন্তু তাদের বাপ-দাদারা যদি কোন কথা বুঝতে না পেরে থাকে এবং তারা যদি সৎপথে না চলে থাকে, তবুও কি তারা তাদের অনুসরণ করবে?" (বাকারা ঃ ১৭০)

সাধারণভাবে প্রত্যেক যুগের জাহেল লোকেরা এ ধরনের গোমরাহীতে ডুবে থাকে। হযরত মূসা (আঃ) যখন সেই যুগের লোকদেরকে আল্লাহ্র শরীয়তের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন তখনও তারা একথাই বলেছেনঃ

"আমাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে তুমি কি সেই পথ হতে আমাদেরকে ভুলিয়ে নিতে এসেছো?" (ইউনুস ঃ ৭৮)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন তাঁর গোত্রের লোকদেরকে শিরক হতে ফিরে থাকতে বললেন, তখন তারাও একথটি বলেছিলঃ **"আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এই দেবতারই পূজা করতে দেখেছি।"** (আম্বিয়া ঃ ৫৩)

মোটকথা প্রত্যেক নবীরই দাওয়াত শুনে সেই যুগের লোকেরা শুধু একথাই বলেছে, "তোমরা যা বলছো তা আমাদের বাপ-দাদার নিয়মের বিপরীত। কাজেই আমরা তা মানতে পারি না।"

এসব কথা প্রকাশ করার পর আল্লাহ্ তাআলা বলেন, তোমরা হয় বাপ-দাদারই নিয়ম প্রথার অনুসরণ কর, না হয় খাঁটিভাবে কেবল আমারই হুকুম মেনে চল; কিন্তু এ দুটি জিনিস একত্রে ও এক সাথে কখনও পালন করতে পারবে না। দু'টি পথের মধ্যে মাত্র একটি পথ ধরতে পারবে। মুসলমান হতে চাইলে সবকিছু পরিত্যাগ করে কেবল আমার হুকুম পালন করে চলতে থাক।

তৃতীয় পথ হচ্ছে ঃ

মানুষ যখন আলাহ্র হুকুম ছেড়ে দিয়ে মানুষের হুকুম পালন করতে শুরু করে এবং ধারণা করে যে, অমুক ব্যক্তির হাতে আমার রিযক, কাজেই তার হুকুম অবশ্যই পালন করা উচিত অথবা অমুক ব্যক্তির শক্তি ও ক্ষমতা অনেক বেশী, এজন্য তার কথা অনুসরণ করা আবশ্যক; কিংবা অমুক ব্যক্তি বদ দোয়া করে আমাকে ধ্বংস করে দিবে অথবা অমুক ব্যক্তি আমাকে নিয়ে বেহেশতে যাবে, কাজেই সে যা বলে তা নির্ভুল মনে করা কর্তব্য অথবা অমুক আলেমরা আমার দলের নেতা অনেক জ্ঞানবান ব্যক্তিবর্গ উনারা যা বলে তা নির্ভুল, উনারা কোন ভুলই করতে পারে না, উনারা কি কম জানে অতএব তাদের হুকুম অবশ্যই পালন করা উচিত (যদিও তারা শিরকের পথে নিয়ে যায়) অথবা এই দলের মাধ্যমে আমি ইসলামে এসেছি (যদিও দলের কর্মসূচী শিরর্কের সাথে মিশে তারা ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে) অতএব আমি এ দল কখনও ছাড়তে পারবো না। অথবা অমুক জাতি আজকাল খুব উন্নতি করছে, কাজেই তাদের নিয়ম অনুসরণ করা উচিত, তখন সে কিছুতেই আল্লাহ্র হেদায়াত অনুযায়ী কাজ করতে পারে না।

"তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করে চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে ভুলিয়ে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাবে।" (আনআম ঃ ১১৬)

অর্থাৎ মানুষ সোজা পথে ঠিক তখনই থাকতে পারে যখন তার আল্লাহ্ কেবলমাত্র একজনই হবে। যে ব্যক্তি শত শত এবং হাজার হাজার লোককে 'রব' বলে স্বীকার করবে সে সোজা পথ কখনই পেতে পারে না। ওলেমা, মাশায়েখ, আমীর, দল, নেতাকে তাকলিদ বা অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে তাদের ইবাদত করা শুরু করে মানুষ। এরশাদ হচ্ছে

"তারা নিজেদের ওলামা-মাশায়েখদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছিলো, এমনি করে মসীহ ইবনে মারিয়ামকেও। অথচ তাদের এক ইলাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয় নি। **(তওবা ঃ ৩১)**

আদি ইবনে হাতিম (রাঃ) (যিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাসারা ছিলেন) রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমরা তো কখনো ওলামা-মাশায়েখ, পাদ্রী পুরোহিতদের পূজা করি নি। জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন; তারা যে জিনিসকে হালাল জ্ঞান করেছে, তোমরা কি তাকে হালাল জ্ঞান কর নি? আর তারা যে জিনিসকে হারাম করেছিল, তোমরা কি তাকে হারাম বানিয়ে নাও নি?

(আহমদ, আত-তিরমিজী, ইবনে জারীর)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে রাসূল (সাঃ) থেকে জানলাম যে, আলেম ও নেতাদের অনুসরণের একটা সীমা রয়েছে। যখনই তারা আল্লাহ্‌র দেয়া সীমা অতিক্রম করে মানুষকে (অনুসারিদের) শিরক কুফর করার বা হালাল হারাম পরিবর্তন করার নির্দেশ দেয় তখনই আবুল হাকাম (জ্ঞানের পিতা) পরিণত হয় আবু জেহেলে (মূর্খের পিতায়)। অর্থাৎ এই সকল আলেম, নেতা ও পীরেরা আল্লাহ্‌র দাস হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রব হিসেবে যে অধিকার (হালাল-হারামের বিধান দেওয়া) তা নিজেরা পরিবর্তন করে নিজেদের মনের মত করে হালাল হারামের সংজ্ঞা দেয় এবং সীমালংঘনকারী তাগুতে পরিণত হয়। যারা তাদেরকে অনুসরণ করল তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে ঐ সমস্ত সীমালংঘণকারী তাগুতদেরকে নিজেদের ইলাহ বানিয়ে মুশরিকে পরিণত হয়। তাই আলেম যা বলল তা দলিল নয় বরং আলেম যা বলল তা প্রমাণের জন্য কুরআন সুন্নাহর দলিল দরকার। যদি মনে করি এত বড় আলেম ভুল বলল তবে মনে রাখা দরকার যে শুধুমাত্র রাসূল (সাঃ) মাসুম ছিলেন এবং তাকেই একমাত্র অনুসরণ করা যাবে আর কেউ নয়। ইবলিসও অনেক বড় আলেম এবং আবেদ ছিল কিন্তু সবচেয়ে বড় পথভ্রষ্টতা তার দ্বারাই শুরু।

অনেকে মনে করে এই দলে এসে আমি ইসলাম পেয়েছি। অতএব যাই হোক এই দল ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় যদিও দলের কর্মসূচী শিরকের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই লোক আল্লাহকে আল-হাদী (হেদায়েত

দানের একমাত্র অধিকারী) না ভেবে দল তাকে হেদায়াত দিয়েছে ভাবে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার জায়গায় তার দল তার ইলাহতে পরিণত হয়।

এই তিনটি বড় বড় 'দেবতা' মানুষের ইলাহ হবার দাবী করে বসে আছে। যে ব্যক্তি মুসলমান হতে চায় তাকে সর্বপ্রথম এই তিনটি 'দেবতাকেই' অস্বীকার করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ তিন প্রকারের দেবতাকে, নিজের মনের মধ্যে বসিয়ে রাখবে এবং এদের হুকুম মত কাজ করবে, আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দাহ হওয়া তার পক্ষে বড়ই কঠিন। ওপরে যে তিনটি 'দেবতার' উল্লেখ করছি, এদের দাসত্ব করাই হচ্ছে আসল শিরক। আপনারা পাথরের দেবতা ভাংগিয়েছেন, ইট ও চুনের সমন্বয়ে গড়া মূর্তি ও মূর্তিঘর আপনারা ধ্বংস করেছেন; কিন্তু আপনাদের বুকের মধ্যে যে মূর্তিঘর বর্তমান রয়েছে, সেই দিকে আপনারা মোটেই খেয়াল করেননি। অথচ মুসলমান হওয়ার জন্য এ মূর্তিগুলোকে একেবারে চূর্ণ করে দেয়াই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা দরকারি কাজ ও সর্বপ্রথম শর্ত।

আল্লাহর হুকুম পালন করা দরকার কেন?

একজন মানুষ জিজ্ঞেস করতে পারে যে, আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করারুদরকারটা কি? তিনি কি আমাদের আনুগত্য পাবার মুখাপেক্ষী? দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা যে রকম নিজেদের হুকুমাত চালাবার জন্য লালায়িত, আল্লাহ্ কি তেমন লালায়িত?

দুনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান রাজকর্মচারীগণ তো শুধু নিজেদেরই স্বার্থের জন্য লোকদের ওপর তাদের হুকুমাত চালায়- কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার কোন স্বার্থ নেই, তিনি সকল রকম স্বার্থের নীচতা হতে পবিত্র। প্রাসাদ তৈরি করা, মোটর গাড়ী ক্রয় করা কিংবা আপনাদের টাকা-পয়সায় বিলাস-ব্যসন বা আরাম -আয়েশের সামগ্রী সংগ্রহ করার কোন প্রয়োজনই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নেই। তিনি পাক, তিনি কারো মোহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার সবকিছুই তাঁর, সমস্ত ধন-সম্পদের তিনিই একমাত্র মালিক। তিনি আপনাদেরকে তাঁর হুকুম মেনে চলতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে বলেন, শুধু আপনাদেরই মংগলের জন্য- আপনাদেরই কল্যাণ করতে চান তিনি। তিনি মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' করে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর এ শ্রেষ্ঠ মাখলুক বা বিরাট সৃষ্টি মানুষেরা শয়তানের গোলামী করুক, অন্য মানুষের দাস হোক এটা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

"হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করোনা, কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন"। **(ইয়াসীন ঃ ৬০)**

তিনি যে মানুষকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন, তারা মূর্খতার অন্ধকারে ঘুরে মরুক এবং পশুর মত নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চলে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত হোক-এটাও তিনি চান না। এজন্যই তিনি মানুষকে বলেছেনঃ

"দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে কোন জোর-যবরদস্তি নেই। হেদায়াতের সোজা পথ গোমরাহীর বাঁকা পথ হতে ভিন্ন করে একেবারে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। এখন তোমাদের মধ্যে যারাই মিথ্যা ইলাহ এবং ভ্রান্ত পথে চালনাকারীদেরকে (তাগুত) ত্যাগ করে কেবল এক আল্লাহ্‌র প্রতিই ঈমান আনবে, তারা এত মযবুত রজ্জু ধারণ করতে পারবে, যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয়। আলাহ্‌ সবকিছুই শুনতে পান এবং সবকিছুই তিনি অবগত আছেন। যারা ঈমান আনলো তাদের রক্ষাকারী হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তাআলা, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে মুক্তি দান করে আলোকের উজ্জলতম পথে নিয়ে যান। আর যারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে তাদেরকে রক্ষা করার ভার তাদের মিথ্যা তাগুত ও গোমরাহকারী নেতাদের ওপর অর্পিত হয়। তারা তাদেরকে আলো হতে পথভ্রষ্ট করে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। তারা দোযখে যাবে ও সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।"

-(বাকারাহ ঃ২৫৬-২৫৭)

আল্লাহকে ছেড়ে অন্যান্য মিথ্যা ইলাহর হুকুম মানলে ও তাদের আনুগত্য করলে মানুষ কেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়, আর কেবল আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলেই কেন আলোকোজ্জল পথ লাভ করা যাবে তা আপনাদের বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

আপনারা দেখছেন, দুনিয়ায় আপনাদের জীবন অসংখ্য রকম সম্পর্কের সাথে জড়িত। আপনাদের প্রথম সম্পর্ক আপনাদের দেহের সাথে। হাত, পা, কান, চোখ, জিহ্বা, মন, মগজ এবং পেট সমস্ত আল্লাহ্‌ তাআলা আপনাদেরকে দান করেছেন আপনাদের খেদমত করার জন্য। কিন্তু এগুলো দ্বারা আপনারা কিভাবে খেদমত নিবেন, তা আপনাদেরই বিচার করতে হবে। এরা সবাই আপনার চাকর এদের দ্বারা আপনি ভাল কাজও করাতে পারেন, আর পাপের কাজও করাতে পারেন। এরা আপনার কাজ করে আপনাকে উচ্চতম মর্যাদার মানুষেও পরিণত করতে পারে আবার এরা আপনাকে জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট ও নীচ জীবও বানিয়ে দিতে পারে।

অতঃপর আপনার নিকটতম সম্বন্ধ আপনার ঘরের লোকদের সাথে--বাপ-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সকলের সাথে। এদের ওপর আপনার কি 'হক' (অধিকার) আছে এবং আপনার ওপরই বা এদের কি অধিকার আছে, তা আপনার ভাল করে জেনে নেয়া দরকার। মনে রাখবেন, এদের সাথে আপনার ব্যবহার সুষ্ঠু হওয়ার ওপরই আপনার দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তি ও সফলতা নির্ভর করে।

এরপর আসে দুনিয়ার অন্যান্য অগণিত লোকের সাথে আপনার সম্পর্কের কথা। অনেক লোক আপনার পাড়া-পড়শী, বহুলোক আপনার বন্ধু, কতগুলো লোক আপনার দুশমন। আপনি কারোও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেন এবং কাউকে আপনি কিছু দেন। কেউ আপনার বিচারক আর আপনি অন্য কারো বিচারক। আপনি কাউকে হুকুম দেন আবার আপনাকে কেউ হুকুম দেয়।

আপনাকে এমনভাবে আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হতে হবে যেন আপনি কারো হক নষ্ট করেননি, কারোও ওপর যুলুম করেননি, কেউ আপনার বিরুদ্ধে কোন নালিশ করে না, কারোও জীবন নষ্ট করার দায়িত্ব আপনার ওপর নেই এবং কারো জান-মাল ও সম্মান আপনি অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেননি।

এখন আপনারা চিন্তা করুন যে, আপনাদের দেহের সাথে, আপনার পরিবারের লোকদের সাথে এবং দুনিয়ার অন্যান্য সমস্ত লোকের সাথে সঠিক সম্পর্ক রাখার জন্য জীবনের প্রতি ধাপে আপনার জানা চাই যে, কোনটা মিথ্যা? সুবিচার কি এবং যুলুম কি ? আপনার ওপর কার কি পরিমাণ অধিকার আছে এবং আপনারই বা কার ওপর কি পরিমাণ অধিকার আছে? কিন্তু এসব কিছুর জ্ঞান আপনি কোথায় পেতে পারেন? এটা যদি আপনি আপনার মনের কাছে জানতে চান, আপনার মন নিজেই অজ্ঞ ও মূর্খ, নিজের স্বার্থ ও অসৎ কামনা ছাড়া আর কিছু জানা নেই। সে তো বলবেঃ মদ খাও, যেনা কর, হারাম উপায়ে টাকা রোযগার কর। কারণ এসব কাজে খুবই আনন্দ আছে। সে বলবে, সকলেরই হক মেরে খাও, কাউকে হক দিও না। কারণ তাতে লাভ ও আছে, আরাম ও আছে। মন যা চায়, যদি কেবল তাই করেন, এতে আপনার দ্বীন-দুনিয়া সবকিছু নষ্ট হবে।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে এই যে, আপনারই মত অন্য মানুষের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করবেন তারা যেদিকে চালায়, আপনি অন্ধভাবে সেদিকেই চলবেন। এ পথ যদি অবলম্বন করেন, তবে কোন স্বার্থপর লোক এসে আপনাকে তার নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত এবং নিজের স্বার্থোদ্ধারের জন্য ব্যবহার করতে পারে, এর খুবই আশংকা আছে। অথবা কোন যালেম ব্যক্তি আপনাকে হাতিয়ার স্বরূপ গ্রহণ করে আপনার দ্বারা অন্যের ওপর যুলুম করাতে পারে। মোটকথা, অন্য লোকের অনুসরণ করলেও আপনি জ্ঞানের সেই জরুরী আলো লাভ করতে পারেন না, যা আপনাকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে, ন্যায় ও অন্যায় বলে দিতে পারে এবং আপনার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

এরপর যেখান থেকে আপনি আপনার এ অত্যাবশ্যক জ্ঞানের আলো লাভ করতে পারেন। সেই উপায়টি হচ্ছে আপনার ও নিখিল জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ তাআলা। আল্লাহ্‌ তাআলা সবকিছুই অবগত আছেন, সবকিছুই দেখতে পান, প্রত্যেকটি জিনিসের প্রকৃতি তিনি ভাল করেই জানেন ও বুঝেন। একমাত্র তিনিই বলে দিতে পারেন যে, কোন জিনিসে আপনার প্রকৃত উপকার, আর কোন জিনিসে আপনার আসল ক্ষতি হতে পারে, কোন কাজ আপনার করা উচিত, কোন কাজ করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌ তাআলার কোন কিছুর অভাব নেই, তাঁর কোন স্বার্থ নেই, তিনি কারোও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। তিনি ধোঁকা দিয়ে (নাউযুবিল্লাহ) আপনার কাছ থেকে তাঁর নিজের কোন স্বার্থ আদায় করবেন না। কারণ তিনি পাক-পবিত্র, তিনি সবকিছুর মালিক, তিনি যা কিছু পরামর্শ দিবেন তার মধ্যে তাঁর নিজের স্বার্থের কোন গন্ধ নেই এবং তা কেবল আপনারই উপকারের জন্য। এছাড়া আল্লাহ্‌ তাআলা ন্যায় বিচারক, তিনি

কখনই কারো ওপর অবিচার করেন না। কাজেই তাঁর সকল পরামর্শ নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ, ন্যায় ও ফলপ্রসু হবে। তাঁর আদেশ অনুযায়ী চললে আপনার নিজের ওপর বা অন্য কারো ওপর কোন যুলুম হবার আশংকা নেই।

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে যে আলো পাওয়া যায়, তা থেকে কল্যাণ লাভ করা দু'টি জিনিসের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে। প্রথম জিনিস এই যে, আল্লাহ্ তাআলা এবং তিনি যে নবীর মাধ্যমে এ আলো পাঠিয়েছেন সেই নবীর প্রতি আপনাকে প্রকৃত ঈমান আনতে হবে, আপনাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্র কাছ থেকে তাঁর রাসূল যে বিধান ও উপদেশ নিয়ে এসেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য; তার সত্যিকার উপকারিতা যদি আপনি অনুভব করতে না-ও পারেন তবুও আপনাকে একথা বিশ্বাস করতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঈমান আনার পর আপনি আপনার জীবনের প্রত্যেকটি কাজেই আল্লাহ্র সেই বিধান অনুসরণ করে চলবেন। কারণ তার প্রতি ঈমান আনার পর কার্যত তাঁর অনুসরণ না করলে সেই আলো হতে কিছুমাত্র ফল পাওয়া যেতে পারে না। মনে করুন, কোন ব্যক্তি আপনাকে বললো, অমুক জিনিসটি বিষ, তা প্রাণীর প্রাণ নাশ করে; কাজেই তা খেও না। আপনি বললেন, হাঁ ভাই, তুমি যা বলেছ তা খুবই সত্য, তা যে বিষ এবং তা প্রাণ ধ্বংস করে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সত্য জেনে-শুনে বিশ্বাস করে এবং মুখে স্বীকার করেও আপনি তা খেলেন। এখন বিষের যা আসল ক্রিয়া তা তো হবেই। জেনে খেলেও হবে, না জেনে খেলেও হবে। আপনাকে যে কাজের হুকুম দেয়া হয়েছে, কেবল মুখে মুখে তাকে সত্য বলে স্বীকার করেই বসে থাকবেন না বরং তাকে কাজে পরিণত করবেন। আর যে কাজ করতে আপনাকে নিষেধ করা হয়েছে, শুধু মুখে মুখে তা থেকে ফিরে থাকার কথা মেনে নিলে চলবে না, বরং আপনার জীবনের সমস্ত কাজ-কারবারেই সেই নিষিদ্ধ কাজ হতে ফিরে থাকতে হবে। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা বার বার বলেছেনঃ **"আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মেনে চল।"**

(আন নিসা ঃ ৫৯)

"যদি তোমরা রাসূলের অনুসরণ কর, তবেই তোমরা সৎপথের সন্ধান পাবে।"

(সূরা আন নূর ঃ ৫৯)

"যারা আমার রাসূলের হুকুমের বিরোধিতা করছে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের ওপর বিপদ আসতে পারে।"-(সূরা আন নুর ঃ ৬৩)

শেখ জায়েদ ফাহিম (জুনায়েদ) এ প্রসঙ্গে বলেন, কেবল আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলেরই আনুগত্য করা উচিত; এর অর্থ এই নয় যে, কোন মানুষের হুকুম আদৌ মানতে হবে না। অন্য যে কোন বৈধ আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্রই আনুগত্য কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদের আনুগত্য করার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

১) আমরা শুধুমাত্র তারই আনুগত্য করতে পারি যার আনুগত্য করার হুকুম স্বয়ং আল্লাহ্ দিয়েছেন ঃ যেমন খলিফাহ (আমীরুল মুমিনীন এবং শুধুমাত্র তার নিয়োগকৃত আমীরগণ), পিতামাতা, স্বামী ইত্যাদি। যখনই আলাহ্ তাঁর ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করার কথা বলেছেন তখনই সেই আনুগত্যকে তিনি তাওহীদ অথবা শরীয়াহ অথবা তার নিজের আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

"আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর।" **(আল-বাকারাহ ঃ ৮৩)**

"আমরা মানুষকে নিজেদের পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোন (মাবুদকে) শরীক বানানোর জন্য চাপ দিয়ে থাকে যাকে তুমি (আমার শরীক) বলে জান না, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না আমারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদিগকে জানাব যে তোমরা কি করছিলে!" **(লোকমানঃ ১৫)**

এই একই নিয়ম রাসূল (সাঃ) এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়েছে।

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করবে সে সেইসব লোকদের সংগী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা নিয়ামত দান করেছেন তারা হচ্ছে আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎলোকগণ।" **(আন-নিসা ৬৯)**

পক্ষান্তরে "যে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সাঃ) নাফরমানী (অবাধ্যতা) করবে এবং তার নির্ধারিত সীমাসমূহকে লংঘন করবে তাকে আল্লাহ্ আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে সব সময় থাকবে আর ইহা তার জন্য অপমানকর শাস্তি বিশেষ"। **(আন-নিসা ১৪)**

অনেক আয়াতে রাসূল (সাঃ) যে আল্লাহ্ সুবহানুতায়ালার কর্তৃত্ব ও হুকুমের অধীন তা পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

"হে নবী! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না।" **(আহযাব-১)**

অধিকন্তু নবীর আনুগত্য শর্তহীন কেননা নবী (সাঃ) কাজ করতেন ওহীর ভিত্তিতে ও তার হুকুম ও ছিল ওহীর ভিত্তিতে।

"যে রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য করল সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র আনুগত্য করল।" **(নিসা ঃ ৪০)**

এবং নবী (সাঃ) বলেন ঃ "যে আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল এবং যে আমার অবাধ্যতা করল সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল এবং যে আমার আমীরের (খলীফা বা আমীরুল মুমেনীন এবং তার নিয়োগকৃত বৈধ আমীরগণ) আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল এবং যে আমার

আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমার অবাধ্যতা করল ।" (বুখারী কিতাবুল আহকাম এবং মুসলিম কিতাবুল ইমারাহ)

আল হারিস আল আশয়ারী রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্ আমাকে পাঁচটি কাজের হুকুম দিয়েছেন এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের হুকুম দিচ্ছি । **শুনা ও মানা, জিহাদ, হিজরাত ও জামায়াতবদ্ধ হওয়া** কেননা যে আল-জামায়াহ (সমস্ত দুনিয়ার মুসলিমদের শুধুমাত্র একটি শরয়ী জামায়াহ বা জামায়াতুল মুসলিমীন) থেকে এক বিঘত দূরে সরে যায় সে ইসলামের রজ্জু গলা থেকে খুলে ফেলে । (আহমাদ ৪/১৩০,২০২)

শেষোক্ত দুই হাদীসে দেখানো হয়েছে যে খলিফার আনুগত্যের মাঝে নবীর আনুগত্য ও নবীর আনুগত্যের মাঝে আল্লাহ্র আনুগত্য নিহিত । এটা এই আয়াত থেকে পরিষ্কার ।

"হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো, রাসুলের আনুগত্য করো এবং সে সব লোকদেরও আনুগত্য করো, যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্ব সম্পন্ন । আর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে মীমাংসার জন্য বিষয়টিকে আল্লাহ্র ও তাঁর রাসুলের নিকট প্রত্যার্পন করো যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান এনে থাকো । এটাই মঙ্গলজনক এবং পরিণতির দিক দিয়ে এটাই উত্তম ।" (সূরা নিসা-৫৯)

[বিঃ দ্রঃ এখানে একটা বিষয় বুঝা অত্যন্ত জরুরী । উলিল আমর বা আমীরের আনুগত্য বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন । বর্তমান সময়ে যে কেউ একটা নাম দিয়ে ইসলামী দল বা ফেরকা বানিয়ে নেয় আর আমির হয়ে এ আয়াত দেখিয়ে মুসলিম জনগণের বা তার অনুসারীদের কাছে আনুগত্য দাবি করে ও বলে আল্লাহ্ তাকে আনুগত্য করতে বলেছে এবং তার আনুগত্য না করলে জাহান্নাম যেতে হবে ইত্যাদি । এ প্রসঙ্গে হুদাইফাহ্ বিন আল-ইয়ামান (রাঃ) থেকে দুটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণিত একটা দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ তুলে ধরছি । হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ

তারপর আমি (হুদাইফাহ্ বিন আল-ইয়ামান) জিজ্ঞেস করলাম ঐ আংশিক ভালোর পর কি আবার মন্দ আসবে? তিনি (সাঃ) জবাব দিলেন "হ্যাঁ দোজখের আগুনের ফটকের আহবানকারীরা (অর্থাৎ ইসলামীদলের নামধারী ফিরকার নেতারা), যে ব্যক্তিই তাদেরকে ইতিবাচক জবাব দেবে (অর্থাৎ তাদের বানান ইসলামী দলে বা ফিরকায় যোগ দিবে) তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে ।" আমি তখন তাকে তাদের সম্পর্কে আমাদের কাছে বিবরণ দিতে বললাম, তিনি বললেন, "তারা আমাদের জাতির লোক হবে, এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে ।" (অথাৎ মুসলিম জাতির লোক এবং ইসলামের ভাষায় কথা বলবে) আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- আমি যদি সে সময় বেঁচে থাকি তাহলে আপনি আমাকে কি উপদেশ দেবেন, তিনি (সাঃ) বললেন, মুসলমানদের মূল অংশের (জামায়াতুল মুসলিমীন) এবং তাদের ইমামের (খলিফাহ) সাথে লেগে থাকবে ।" আমি জিজ্ঞেস করলাম যদি আল জামায়াহ এবং তার ইমাম (খলিফা) না থাকে তাহলে কি করবো । তিনি জবাব দিলেন "সকল দল থেকে

বেরিয়ে যাও এমনকি সেক্ষেত্রে যদি তোমাকে তোমার (তুমি যখন তোমার ঐ অবস্থায় থাক) কাছে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত গাছের তলায় বসে থাকতে হয় তবুও ।" (BUKHAARI English/Arabic: vol. 4 [803] and vol. 9 [206]. MUSLIM [. 4553])

উপরোক্ত হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল-জামায়াহ জামায়াতুল মুসলিমীন এবং তার খলীফা ও তার মনোনীত আমীরের হুকুম পালন আল্লাহ্র হুকুম পালনেরই নামান্তর । যে কোন ইসলামী দল বা ফিরকার নেতার আনুগত্য আমার জন্য ওয়াজিব নয় । উপরন্তু আল-জামায়াহ বা জামায়াতুল মুসলিমীন এবং তার খলীফাহকে না পাওয়া গেলে এই সকল ইসলামী নামধারী ফেরকা থেকে বেঁচে থাকার হুকুম দেওয়া হয়েছে । উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে আনুগত্য শুধু তাদেরই করা যাবে যাদের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছেন ।]

[কুরআন ও সুন্নাহ দলীল ভিত্তিক আল জামায়াহ ও আমীরুল মুমিনীন বা খলিফা সম্পর্কে জানতে হলে পরবর্তী বই আল জামায়াহ সংগ্রহ করুন ।]

২) আমরা শুধুমাত্র সেইসব নির্দেশই মানব যা আল্লাহ্র হুকুম ও ইসলামের নীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল ঃ আলী (রাঃ) রাসূল থেকে বর্ণনা করেন "(আলাহ্র) অবাধ্যতার মাঝে কোন আনুগত্য নেই । আনুগত্য শুধুমাত্র মারুফ কাজে (মুসলিম কিতাবুল ইমারাহ (নং ৪৫৩৬ বুখারী (ইংরেজী ভার্সন ভলিয়ম ৯ নং ২৫৯১) । নওয়াস বিন সামআন নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন "স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না ।" (ইমাম বাগহাউই শরহে সুন্নাহ [১০/৪৪) আহমদ, আল হাকিম)

৩) আমরা তাদের আনুগত্য করব শুধুমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য এবং এই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাদের আনুগত্য করব না ঃ

বল- **"আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু সবই সারা জাহানের রব আল্লাহ্র জন্য ।"** (আনআম ঃ ১৬২)

"যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চায় তার সেই পন্থা একেবারেই কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।"

(ইমরান ঃ ৮৫)

যদি উপরোক্ত ৩টি শর্ত না পাওয়া যায় তাহলে এ সকল লোকের প্রতি আনুগত্য করার ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে শিরক বা হারাম হতে পারে । যদি এই আনুগত্য আল্লাহ্র আনুগত্য করার কোন উদ্দেশ্য বা নিয়ত যদি ঐ ব্যক্তির মধ্যে না থাকে তাহলে এটা হবে আনুগত্যের ক্ষেত্রে শিরক এবং তা ইসলাম থেকে বের করে দেয় যদিও যাদের মান্য করা হচ্ছে তারা পিতা-মাতা, স্বামী বা খলীফা হয় এবং তাদের হুকুম ও ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় ।

আসলে এর অর্থ এই যে, আপনারা অন্ধ হয়ে কারো পিছনে চলবেন না । আল্লাহ্ তাআলা যা কিছু হুকুম আহকাম দিয়েছিলেন, তা সবই এখন পবিত্র-কুরআন ও হাদীসের মধ্যে নিহিত আছে । কিন্তু এ কুরআন শরীফ এমন কোন জিনিস নয়, যা নিজেই আপনাদের সামনে এসে আপনাদরকে আল্লাহ্র কথা বলবে ও হুকুম

দান করবে এবং আপনাদেরকে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ পথ হতে বিরত রাখবে। আল্লাহর মনোনীত বৈধ মানুষই আপনাদেরকে কুরআন ও হাদীস অনুসারে পরিচালিত করবে। কাজেই মানুষের অনুসরণ না করে কোন উপায় নেই। অবশ্য অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, আপনারা কোন মানুষের পিছনে অন্ধভাবে চলবেন না। আপনারা সতর্কভাবে শুধু এতটুকুই দেখবেন যে, সেই খলিফা বা আমীরুল মুমিনীন ও উনার নিয়োগকৃত বৈধ আমীরেরা আপনাদেরকে পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুসারে পরিচালিত করে কি না। যদি কুরআন ও হাদীস অনুসারে চালায় তবে তাদের অনুসরণ করা আপনাদের কর্তব্য এবং তার বিপরীত পথে চালালে তাদের অনুসরণ করা পরিষ্কার হারাম।

ইবাদত কিভাবে করতে হবে

"আকাশ, পৃথিবী ও দু'য়ের মধ্যবর্তী বিষয়গুলোকে আমরা ছেলেখেলার জন্যে সৃষ্টি করিনি। যদি খেলনা তৈরী করাই আমাদের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে (অন্যবিধ উপায়ে) খেলার সরঞ্জাম সৃষ্টি করতাম।" (আম্বিয়া ১০-১২)

এই আয়াত থেকে বুঝা গেল স্রষ্টা একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার অগণিত নিয়ামক আমাদের ভোগ করতে দিয়েছেন। তিনি আমাদের থেকে যা চান তা হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা শুধু উনার হুকুমের অনুসরণ করব অর্থাৎ শুধুমাত্র উনার ইবাদত করব। ইবাদত করলে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব (Pleasure of Allah s.w.t) এবং উনি সন্তুষ্ট হলে আমরা জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে বাঁচতে পারবো এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। এখন একজন ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ কিংবা হিন্দুকে জিজ্ঞাস করেন কেন দুনিয়াতে এসেছে? তারাও কিন্তু আপনাকে বলবে 'গড' বা ঈশ্বর 'ভগবানের' ইবাদত করতে এসেছি। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? খ্রীস্টানদের দেখুন 'গড' এর সন্তুষ্টির জন্য পাদ্রী এবং নানরা বিয়ে করা ছেড়ে দিয়েছে । হিন্দু সন্নাসীদের দেখুন 'ভগবানের' সন্তুষ্টির জন্য উচ্চ মর্যাদার (হিন্দুদের মাঝে) পুরোহিতরা পশুর ন্যায় উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের এ সকল আত্মদানে কি তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে? কখনও নয় এরা সকলে **شر البرية (সাররুল বাড়িয়্যা) বা নিকৃষ্টতম জীব (Worst of creatures)** কারণ তারা আল্লাহর হুকুমের তোয়াক্কা না করে নিজেদের ইচ্ছামত ইবাদতের পন্থা উদ্ভাবন করে নিয়ে নিজেরা আমল করছে এবং তাদের অনুসারীদেরকে এ সকল ভ্রান্ত আমলের দিকে ডাকছে।

"রাহবানিয়াত (অত্যধিক ভয়ের কারণে গৃহীত কৃচ্ছসাধনা ও বৈরাগ্য নীতি) তারা নিজেরাই রচনা করে নিয়েছে। আমরা তাদের উপর এ নীতি লিখে ফরয করে দেইনি। বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সন্ধানে তাহারা নিজেরাই এই বিদ'আত' বানাইয়াছে।" (আল হাদীদ ঃ ২৭)

অতএব পরকালে এদের স্থান হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এদের সম্পর্কে কোরআনে বলেনঃ

"বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।" [সূরা কাহাফ ১০৩-১০৪]

অর্থাৎ 'ইবাদত' করতে হবে ইলাহর ইচ্ছা অনুযায়ী দলিল মোতাবেক (কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত পদ্ধতিতে)। নিজের আলেম, পুরোহিত, পাদ্রী, বুজুর্গ, বাপ, দাদার এবং নিজের নফসের ইচ্ছা অনুযায়ী নয়। যিনি রব, মালিক ইলাহ তার ইচ্ছানুযায়ীই তার বান্দাকে চলতে হবে। এরশাদ হচ্ছেঃ

"তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহ্‌র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্টভাবে তাঁহার ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দ্বীন।" [বাইয়্যিনাহ ০৫]

"বল, "হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছো?" [আয যুমার ঃ ৬৪]

আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী ইবাদত করতে হবে বুঝলাম কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা কোনটি কিভাবে বুঝবো। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তায়ালা বলেছেন ঃ

"আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অনন্তকাল সেখানে থাকবে।" (আল-বাকারা ঃ ৩৮-৩৯)

প্রত্যেক রাসূল আল্লাহ্‌ তাআলার তরফ থেকে শরীয়ত ও কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু কোন নবীই শরীয়ত ও কিতাব প্রাপ্ত হননি। তাঁরা শুধু রাসূলদের আনীত কিতাবের মাধ্যমেই তাঁদের উম্মতদেরকে পরিচালিত করতেন। অর্থাৎ সব রাসূলই নবী ছিলেন কিন্তু সব নবী রাসূল (কিতাব ও শরীয়াত প্রাপ্ত) ছিলেন না। অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নবী ও রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে তার ইবাদতের পন্থা বলে দিয়েছেন। জানিয়ে দিয়েছেন কিভাবে তিনি ইবাদত চান।

"প্রতিটি কওমের জন্য রয়েছে পথ প্রদর্শক।" [রাদ ঃ ০৭]

"কোন রাসূল না পাঠিয়ে আমি কাউকে শাস্তি দেই না।" (বনী ইসরাইল ঃ ১৫)

এখন আমাদের বুঝতে হবে ইবাদত করতে হলে দলিল দরকার আর দলিল হল আসমানি কিতাব (কুরআন) ও নবীর সুন্নাহ। রাসূল (সাঃ) আসার পূর্ব পর্যন্ত যত নবী ও রাসূল এসেছেন এবং তারা যে সকল আসমানি কিতাব রবের

কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন তা সেই সকল নবী ও রাসূলের নিজ নিজ উম্মতের জন্য ছিল এবং যেগুলো সবই বাতিল হয়ে গেছে কুরআন নাযিলের পর। কারণ প্রথমত পূর্ববর্তী কিতাবগুলিকে আলেম ও পাদ্রীরা বিকৃত করে ফেলেছে এবং দ্বিতীয়ত শেষ নবী রাসূল (সাঃ) যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন আল কুরআন যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে।

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করিলাম হাদিস ওমর (রাঃ) ও ।" [সূরা মায়েদা ঃ ৩]

"নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ (হে নবী) তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। (নাহল ঃ ৮৯)

এই আয়াতগুলি থেকে বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তারই ইবাদত করার জন্য আমাদের জন্য একটি শরীয়াত এবং একটি কর্মপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এই কুরআনে। অর্থাৎ তিনি কিভাবে আমাদের কাছ থেকে ইবাদত চান তার জন্য আল-কোরআন নাযিল করেছেন এবং রাসূল (সাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন যেন তিনি দেখিয়ে দিয়ে যান কিভাবে আল-কুরআন মোতাবেক ইবাদত করতে হবে। অর্থাৎ আল-কুরআন হল থিওরী এবং আল-হাদীস (সহীহ) হল প্রাকটিক্যাল। হযরত ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চরিত্র কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেনঃ "কুরআনই ছিল রাসূলুলাহ (সাঃ)-এর চরিত্র।" (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ)

এখন কিয়ামত পর্যন্ত আমাদরেকে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা বানী হিসেবে শুধু আল-কুরআনকে অনুসরণ করতে হবে এবং রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহকে মেনে নিতে হবে। ইহুদী খ্রীষ্টানরা যে বানী অনুসরণ করে তা বিকৃত হয়ে গেছে এবং তা বিকৃত হবার যথেষ্ট দলিল প্রমাণ রয়েছে। তারা নিজেরাই দ্বিধাবিভক্ত কোনটা অনুসরণ করবো নিউ টেষ্টামেন্ট না ওলড টেষ্টামেন্ট। তারা বুঝে উঠতে পারছে না তিন গড কিভাবে আবার এক গড হয়ে যায়। তাদের লোকদের দ্বারা বিকৃত করা কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রচুর ভারসাম্যহীন কথা বার্তা। তাদের কিতাবের অবিকৃত থাকার কোন সনদ নাই। অথচ আল কোরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ভারসাম্য পূর্ণ কিতাব। আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা নিজেই একে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।

"আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্য আমিই উহার সংরক্ষক।" [সূরা হিজর ঃ ৯]

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। ধরুন দুনিয়াতে যত কিতাব আছে কোরআন সহ সব এক জায়গায় একত্রিত করে আটকে রাখি।

এবার ঠিক যেইভাবে ছিল পূণর্বার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে দুনিয়ার কোন কিতাবটা আবার অবিকল লিখে রাখা সম্ভব তা বলতে পারেন কি? তা হল আল কোরআন। কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা আল কুরআনকে হেফাযত করবেন বলেছেন আর তিনি হেফাজত করেছেন মানুষের অন্তরে হেফয করার মাধ্যমে। দুনিয়াতে বর্তমানে দুই কোটি হাফেজ রয়েছে। দিন দিন আল্লাহ্র রহমতে হাফেজ বেড়েই চলছে কমছে না। দুনিয়ার অন্য কোন কিতাবের হাফেজ নেই। যার ফলে কোরআন বিকৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই এবং তা শয়তানের দল চাইলেও করতে পারছে না, সাথে সাথে ধরে ফেলা হচ্ছে (সুবহান আল্লাহ্)। এছাড়াও সম্পূর্ন বিজ্ঞানময় কোরআন। ১৪০০ বৎসর আগে রাসূল (সাঃ) যে অহি নিয়ে এসেছিলেন তা আজও জ্ঞান বিজ্ঞানের রহস্য উম্মোচনে প্রধান হাতিয়ার। বিজ্ঞানের অনেক নতুন থিওরী আসে আবার অনেকগুলি ভুল প্রমাণিত হয়ে অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। অথচ কোরআনে মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যা কিছু বলে দিয়েছেন তাই অনন্ত সত্য ও অপরিবর্তনীয়। তেমনি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ থেকে নিয়ে দুনিয়াতে যত ধর্ম এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ আছে তা সবই বিকৃত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন। তাদের কিতাবগুলি না পড়লে বুঝবেন না তা কত কুরুচিপূর্ণ ও ভারসাম্যহীন বিষয় সম্বলিত।

"আল্লাহ অতি উত্তম কালাম নাযিল করিয়াছেন। ইহা এমন এক কিতাব যাহার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ। (আয যুমার ঃ ২৩)

ইবাদত দলিল ভিত্তিক (কুরআন ও সুন্নাহর)

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ফজরের ফরজ নামাজ দুই রাকাত। এখন কেউ যদি চিন্তা করে এত ভোরে কষ্ট করে উঠে কেন শুধু দুই রাকাআত ফরজ নামাজ পড়বো! চার রাকাত পড়ি। রাসূল (সাঃ) দেখিয়ে দিয়ে গেছেন ফজরের ফরজ নামায দুই রাকাত এবং তাতে সর্বমোট দুইটা রুকু চারটা সেজদা করতে হবে, এখন সে যদি ভাবে কম তো আর করিনি চাররাকাত পড়ছি চারটা রুকু আটটা সেজদা দিচ্ছি অসুবিধাটা কিসে। কেউ যদি এত ভাল চিন্তা করে ফজরে চার রাকাত ফরজ নামাজ পড়া শুরু করে আর লোকদেরকেও পড়তে বলে তবে কি হবে বলুন? নিশ্চয় সবাই বলা শুরু করবেন সেই মানুষটা মুরতাদ ও জিন্দিক হয়ে গেছে। কারণ আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার ইচ্ছায় রাসূল (সাঃ) যেভাবে ইবাদতের পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তা লোকটা পরিবর্তন করে ফেলেছে। অতএব ইবাদত ততটুকুই করতে হবে যতটুকু ইলাহ আমাদের থেকে চান এবং সেই পদ্ধতিতেই করতে হবে যে পদ্ধতি আল্লাহ তা'য়ালা উনার রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে দেখিয়ে এবং বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ ইবাদত করতে হলে দলীল দরকার কুরআনের এবং সহীহ হাদীসের। পীরবাবা, আলেম, নেতা বুজুর্গ বলেছে, আমাদের বাপ-দাদারা এভাবে ইবাদত করেছে তাই ইবাদত এভাবে করি বললে চলবে না। আলেম যা বলে তা দলিল না কিন্তু আলেম যা বলে তা প্রমাণ করার জন্য কুরআন আর সুন্নাহর দলিল দরকার। সূরা ফাতেহার

শেষ আয়াতে আমরা পড়ি **غير المغضوب عليهم ولاالضالين "গাইরিল মাগদুব ---- দোয়ালিন**।

এই আয়াতের মাগদুব শব্দের অর্থ হলো অভিশপ্ত এবং দ্বাল্লিন শব্দের অর্থ হলো গোমরাহ (পথভ্রষ্ট)। মাগদুব হলো ইহুদীরা এবং বিশেষ করে তাদের আলেম সমাজ। তারা আল্লাহ্‌র আয়াত লুকিয়ে রেখে আল্লাহ্‌র দেখানো ইবাদতের পন্থা পরিবর্তন করে নিজেদের খেয়াল খুশীমত ইবাদত পন্থা দিত, এ জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশপ্ত বলেছেন। দ্বাল্লিন বা গোমরাহ হল খৃষ্টান জাতি। তাদের আল্লাহ্‌র কিতাবের এবং নবীর সুন্নাহর কোন জ্ঞানই নেই এবং তারা অন্ধভাবে তাদের আলেম ও পাদ্রীদের অনুসরণ করে। এজন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা নিম্নের আয়াত নাযিল করেছেন।

"তারা নিজেদের ওলামা-মাশায়েখদেরকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছিলো।" (সূরা তওবা ঃ৩১)

এবার ভেবে দেখুন প্রতিদিন প্রতি রাকাত নামাযে সূরা ফাতিহাতে আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এর কাছে যে বিষয়ে আশ্রয় চাচ্ছি পুরো মুসলিম জাতি আজ সেই পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত। আমাদের বেশীর ভাগ নামধারী আলেম সমাজ হয়ে গেছে মাগদুব (অভিশপ্ত) কারণ তারা ইসলামের সঠিক ধারণা মানুষকে দিচ্ছে না বরং দ্বীন বিক্রি করে কামাইয়ের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। শিরক, কুফর, বিদয়াত হয় নিজেরা শুরু করেছে অথবা মুসলিম জনগণকে সেই সম্পর্কে অবহিত করছে না পাছে তাদের রোজগার বন্ধ হয়ে যায়; আমাদের আলেম সমাজের একটা বিরাট অংশ বর্তমানে **PEPSI MACHINE'** হয়ে গেছে। পেপসি মেশিনে যেভাবে পয়সা দিলে পেপসি, সেভেন আপ পাওয়া যায় ঠিক তেমনি ডলার দিলে আল্লাহর হালাল হারামের হুকুম পরিবর্তনকারী সুবিধামত যে কোন ফতুয়া পাওয়া যায় এ সকল আলেম নামধারী মাগদুবদের কাছ থেকে। এদের জন্য এরশাদ হচ্ছেঃ

"আমি যে সকল সুস্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি সর্বসাধারণের জন্য কিতাবে তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়ার পরও যারা তা গোপন রাখে, আল্লাহ্ তাদের অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরা তাদের অভিশাপ দেয়।

[সূরা বাক্বারা ঃ ১৫৯]

"এবং সামান্য মূল্যে আমার আয়াতকে বিক্রয় করিও না; আমারই ক্রোধ হইতে তোমরা আত্মরক্ষা কর।" (সূরা বাকারা ঃ ৪১)

আর মুসলিম জনগণ পরিণত হয়েছে 'দাল্লিন' গোমরাহতে। কারণ তাদের দ্বীন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। হুজুর আলেম, নেতা পীর সাহেব যা বলেছে তাই অন্ধভাবে অনুসরণ করছে দলিল কাকে বলে তাই জানে না আর দলিল যাচাই করার প্রশ্নই উঠে না।

ফলে দেখা যাচ্ছে এ সমস্ত পীর, আলেম ও হুজুরগণ কুরআন সুন্নাহর দলিল বর্হিভূত নিত্য নৈমিত্তিক সকল বিদয়াতের সংযোজন করছে এবং মুসলিম জনগণকে শিরক, কুফরে লিপ্ত করেছে এবং তাদের ঈমান আমল বরবাদ করে নিজেরাও জাহান্নামের পথ ধরছে এবং জনগণকেও জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। [বিঃদ্রঃ আমাদের এ আলোচনা আমভাবে সব আলেমদের জন্য নয়। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছায় দুনিয়াতে এখনও অনেক আলেমগণ হকের উপর নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়ে টিকে আছেন।]

রাসূল (সাঃ) বলেছেন "তোমরা পূর্বে আগত লোকদের পথ অনুসরণ করবে [যথাযথভাবে] তারা গুঁই সাপের গর্তে প্রবেশ করলে, তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে" আমরা বললাম "হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এরা কি ইহুদী ও খৃষ্টান। তিনি বললেন তারা ছাড়া আবার কারা। (বুখারী ও মুসলিম)

এবং রাসূল (সাঃ) বলেছেন– "যে কেউ একটি জনগোষ্ঠিকে অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন হয়ে যায়।" (আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমদ বর্ণিত)

"তাহারা বলেঃ কোন ব্যক্তিই বেহেশতে যাইতে পারিবে না যতক্ষণ না সে ইয়াহুদী কিংবা (খৃস্টানদের মতে) খৃষ্টান হইবে। মূলতঃ ইহা তাহাদের মনের কামনা মাত্র। তাহাদের বল, তোমাদের দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হইলে তাহার উপযুক্ত প্রমাণ পেশ কর।" (বাকারাহ ঃ ১১১)

উপরোক্ত আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, ইহুদী খৃষ্টানরা যখন জান্নাতী হওয়ার ভ্রান্ত দাবী করল তখন স্বয়ং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের কাছ থেকে কুরআনের মাধ্যমে দলীল চাইলেন। অতএব দলীল চাওয়া অত্যন্ত জরুরী।

অতএব, আমাদেরকে ইবাদত করার জন্য প্রকৃত জ্ঞান হাসিল করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে আক্বীদা, ঈমান, তাওহীদ, শিরক, কুফর, সুন্নাত, বিদয়াত জামায়াহ, হিজরত, জিহাদ, খলিফা, এবং কালেমা বা শাহাদাতাইন সহ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ সম্পর্কে। কারণ কেয়ামতের সেই কঠিন সময় **জানতাম না** বলে মুক্তি পাওয়া যাবে না। জাহান্নামীদেরকে যখন ফেরেশতারা এক হাতে চুলের মুঠি এবং অন্য হাতে পা ধরে চ্যাংদোলা করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে নিয়ে যাবে, তখন জাহান্নামের পাহারাদারগণ জিজ্ঞেস করবেঃ "তোমাদের কাছে কি কোন সুসংবাদ দাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী পৌঁছেনি? তখন কাফেরগণ বলবেঃ "হ্যাঁ, পৌঁছেছিলো কিন্তু আমরা তাদেরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতাম এবং মিথ্যা মনে করতাম।" **তখন আফসোস করবে এবং বলবেঃ "হায়! আমরা যদি শুনতাম এবং অনুধাবন (জ্ঞান দিয়ে চিন্তা ভাবনা) করতাম, তবে আমরা আজ দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনে নিক্ষিপ্ত লোকদের মধ্যে শামিল হতাম না।"** (সূরা মূলক ঃ ১০)

"হায়! সে সময়ের অবস্থা যদি তুমি দেখতে পারতে, যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে; তখন তারা বলবেঃ হায়! আমরা যদি দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম এবং সেখানে আল্লাহ্‌র

আয়াতকে মিথ্যা মনে না করতাম, আর ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হতে পারতাম।"

–(সূরা আনআম ঃ ২৭)

তাদের এ আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ সরাসরি তাদের কথাকে প্রত্যাখান করবেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"তাদেরকে যদি পূর্ববর্তী জীবনের দিকে ফিরিয়েও দেয়া হয়, তবুও তারা সে সব কাজই করবে যা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তো সবচেয়ে বড়ো মিথ্যাবাদী।" **–(সূরা আনআম ঃ ২৮)**

কাফের ও কুফর

" তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফের কেউ মুমিন। (সূরা আত তাগাবুন ঃ ২)

কুফর অর্থ কোন কিছুকে গোপন করা। 'কুফর' হচ্ছে এক ধরনের মুর্খতা বরং কুফরই হচ্ছে আসল মুর্খতা। মানুষ আল্লাহকে না চিনে মুর্খ হয়ে থাকলে তার চেয়ে বড় মুর্খতা আর কি হতে পারে ? শরীয়তের ভাষায় কুফর বলতে যা বুঝায় তা এখানে আলোচনা করবো। রাসূল(সাঃ) যে শরীয়ত আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন তার মূল বিষয় সমূহ যেগুলি অপরিহার্য, অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয় (অবশ্যই পালনীয় এবং পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই এবং পালন না করলে চরম পরিণতি ভোগ করতে হবে) হুকুম রূপে মেনে চলার জন্য মানব জাতির কাছে উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করা বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে কুফরী কাজ বা কুফরী বলে এবং যে ব্যক্তি এই কুফরীতে লিপ্ত হবে সে কাফেরে পরিণত হবে। অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী কোন বিধানকে বিশ্বাস করা এবং নবী (সাঃ) এর আনীত বিধানকে কিংবা বিধানের যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের। আবার ইসলামকে মানে এবং ইসলামের বিরোধী হুকুম-গুলিকেও মানে এমন ব্যক্তিও মুশরিক কাফের।

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে সকল নবীর উম্মতকে এবং আমাদেরকে ইসলাম নামক দ্বীন দিয়েছেন; এই ইসলাম দ্বীনের জন্য রাসূলদের মাধ্যমে জীবন পদ্ধতি বা শরীয়ত নাজিল করেছেন। একটি শরীয়ত নাজিল করার পর যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষ সেটাকে অমান্য করা শুরু না করেছে এবং বিকৃত না করে ফেলেছে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা আরেকটি শরীয়ত নাজিল করেননি। ঠিক এইভাবে ইহুদী এবং খৃষ্টানরা যথাক্রমে মুসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) এর উপর প্রেরিত তাওরাত ও ইনজিল কিতাবকে অমান্য করে বিকৃত করতে শুরু করার পর শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে , রাসূল হিসেবে আসমানি কিতাব 'আল

কুরআন' এবং সুনির্দিষ্ট শরীয়ত দিয়ে পাঠিয়েছেন দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত । আল্লাহ বলেন :

"এবং বাস্তবিকই এই কিতাবে আমি কোন কিছুই বাদ দেই নাই।" (আন'আম ঃ ৩৮) **এবং "নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ (হে নবী) তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি।** (নাহল ঃ ৮৯)

রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তাতে মানব জীবনের সকল অধ্যায়ের সুস্পষ্ট নিয়ম পদ্ধতি বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিভাবে শারীরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতে হবে (নামায, রোজা, হজ্জ, ইত্যাদি), কিভাবে ব্যক্তি জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে আল্লাহতায়ালার ইবাদত বা হুকুমের অনুসরণ করতে হবে তা হুকুম আকারে রাসূল (সাঃ)-এর উপর নাজিলকৃত শরীয়তের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া আছে। অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য(সুদ বিহীন এবং যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা–ইসলামী অর্থনীতি) কিভাবে করতে হবে; সমাজে বসবাসের জন্য-বিয়ে কিভাবে করতে হবে, সম্পত্তি কিভাবে বন্টন হবে, পিতা-মাতার হক, আত্মীয়ের হক, মুসলিম প্রতিবেশী এবং দরিদ্রের হক, সন্তানদের হক কিভাবে রক্ষা করতে হবে (ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা)। কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা কিভাবে অর্জন করতে হবে (ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা)। আল্লাহর দৃষ্টিতে যে সকল কাজ অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত সে সকল অপরাধের জন্য কিভাবে শাস্তি দিতে হবে(ইসলামী হুদুদ বা শাস্তি ব্যবস্থা)। মানুষের পারস্পরিক বিষয়াদি সংক্রান্ত যাবতীয় ঝগড়া, বিবাদের বিচারের ফয়সালা শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালার নাযিলকৃত এবং মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে কিভাবে করতে হবে (ইসলামী বিচার ব্যবস্থা)। ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ কেমন হবে এবং কিভাবে ইসলামী সংবিধান যার মূল তাওহীদের ঘোষণা "আল্লাহর সার্বভৌমত্ব" দ্বারা দেশ, জনগন এবং প্রশাসন পরিচালিত হবে (ইসলামী শাসন ব্যবস্থা)। এবং ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলেও কিভাবে সমস্ত দুনিয়ার মুসলিমরা এক খলিফার নেতৃত্বে একত্রিত ভাবে থাকবে (অর্থাৎ ছোট ছোট দল বানিয়ে বিভক্ত হয়ে যেন না যায়) ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের কিভাবে চেষ্টা করবে, কিভাবে দারুল কুফরের (শুধুমাত্র আল্লাহর আইন দ্বারা যেখানে দেশ পরিচালিত হয় না অর্থাৎ যেদেশে মানব রচিত আইনের সংবিধান দ্বারা সংসদ ও দেশ চলে) থেকে দারুল ইসলামের(শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক আল্লাহর আইন দ্বারা যে দেশ পরিচালিত হয়) দিকে হিজরত করতে হবে, এক খলিফা বা আমিরুল মুমিনীনের নেতৃত্বে কিভাবে জিহাদ করতে হবে। অমুসলিম জনগন এবং অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে মুসলিমদের আচরন কিভাবে করতে হবে(ইসলামী বিদেশনীতি)। আল্লাহ তায়ালা যে সকল খাদ্য এবং কাজকে হারাম করেছেন যেমন-শুকরের মাংস, মদ, আল্লাহর নামে যবেহ না দেয়া পশুর মাংস , ইত্যাদি অনুরূপ– সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী ইত্যাদি বিষয়াদি থেকে কিভাবে বেচে থাকতে হবে। কোন কোন কাজ

আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে নিষিদ্ধ যেমন–কবীরা গুনাহ সমূহ, কোন কোন কাজ একজন মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং ইসলামে প্রবেশের শর্তসমূহ কি এবং ইসলাম গ্রহনের পর ফরজ ওয়াজিব দায়িত্ব সমূহ কি কি এবং কোন কোন কাজ মানদুব ও মুবাহ তা কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা শেষ নবী রাসূল (সাঃ) এর দ্বারা মুসলিমদের জন্য যে শরীয়ত নাযিল করেছেন অর্থাৎ জীবন-যাপন পদ্ধতি দিয়েছেন তাতে হুকুম আকারে বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন।

এখন যে সকল ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) আনীত ও প্রদর্শিত শরীয়তের পুরোটা বা যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করবে সে কাফের।

"আর যারা কাফির, তাদের জন্য রয়েছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ তাদের আমলসমুহ ব্যর্থ করে দেবেন।" (মুহাম্মদ ৮-৯)

আবার অনেক সময় মানুষে রাসূল (সাঃ) এর শরীয়ত মানে এবং মানব রচিত আইন কানুন ও মানে সে শিরককারী মুশরিক কাফের। তার প্রমাণ নিম্নলিখিত আয়াত

"যে কেউ রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।" (আন-নিসা ১১৫-১১৬)

এ আয়াত দ্বারা পরিস্কার রূপে প্রমাণিত হয় যে রাসূলের প্রদর্শিত পথের বিরোধিতা করা এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য কোন পথ গ্রহণ করা শিরক। এর শাস্তি হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান জাহান্নামে বন্দি করে রাখা। এ বিষয়ের ওপর এদিক দিয়ে আলোচনা হতে পারে যে এটা আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রমাণিত কি না? যদি আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের কথা নির্ধারিত হয়, তাহলে তা নিয়ে কানাঘুষা করা এবং হেকমতের পরিপন্থী আখ্যা দেয়া, একে যুগের পরিপন্থী বলা এবং তা ছেড়ে নিজের মনগড়া পথের বা অন্য কারুর অন্ধ অনুকরণে অন্য পথের আশ্রয় নেয়া সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ্ শিরককে কখনোই ক্ষমা করবেন না।

কয়েক প্রকার কাফেরের উদাহরণ

প্রথম প্রকার কাফের ঃ

আলাহ তায়ালার অস্তিত্বে অস্বীকারকারী ব্যক্তিঃ–যে ব্যক্তি নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী অর্থাৎ আলাহতায়ালার অস্তিত্বকেই যে অস্বীকার করে কিংবা সন্দেহে লিপ্ত ব্যক্তি

কাফের। এ ধরনের মানুষ নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সে আল্লাহকে চেনেনি এবং নিজের নির্বাচন ক্ষমতার সীমানার মধ্যে সে আল্লাহর আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে। এ ধরনের লোক হচ্ছে কাফের। 'কুফর' শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে কোন কিছু ঢেকে রাখা বা গোপন করা। এ ধরনের লোককে 'কাফের' (গোপনকারী) বলা হয়, কারণ সে তার আপন স্বভাবের উপর ফেলেছে অজ্ঞতার পর্দা। সে পয়দা হয়েছে ইসলামী স্বভাব নিয়ে। তার সারা দেহ ও দেহের প্রতিটি অংগ কাজ করে যাচ্ছে ইসলামী স্বভাবের উপর। তার পারিপার্শ্বিক সারা দুনিয়া চলছে ইসলামের পথ ধরে। কিন্তু তার বুদ্ধির উপর পড়েছে পর্দা। সারা দুনিয়ার এবং তার নিজের সহজাত প্রকৃতি সরে গেছে তার দৃষ্টি থেকে। সে এ প্রকৃতির বিপরীত চিন্তা করেছে। তার বিপরীতমুখী হয়ে চলবার চেষ্টা করেছে।

এ জাতীয় ব্যক্তিদের অনেকেই ডারউইন বাদে বিশ্বাসী এবং এদের ধারণা তাদের পূর্ব পুরুষ আগে বানর ছিল এবং বানরের বংশ পরম্পরায় তারা মানুষে পরিণত হয়েছে। এদের আকল বুদ্ধি যে কি পরিমাণ লোপ পেয়েছে তা স্বাভাবিক চিন্তার সকল মানুষই তাদের যুক্তিকে হাস্যকর বলে প্রমাণ করতে পারবে।

দ্বিতীয় প্রকার কাফের ঃ

এরা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতে বিশ্বাস করে। কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে এরা নানাবিধ সংশয়ে লিপ্ত এবং রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) আনীত শরীয়ত যা আলাহ তায়ালার হুকুম আহকামের সমষ্টি তা তারা মানতে নারাজ। এরাও হাক্কানী কাফের যদিও এরা আল্লাহর কিছু কিছু ফরজ হুকুম পালন করে যেমন-নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্জে যায়, কিন্তু জীবনের সকল স্তরে তারা আল্লাহর হুকুম পালনে নারাজ। এদের কাফের হওয়ার উদাহরণ ইবলিসের কাফের হওয়ার অনুরূপ। আমরা কুরআন সুন্নাহ থেকে জানতে পারি ইবলিসের নিম্নলিখিত স্বভাবগুলি।

একঃ ইবলিস আল্লাহতায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধান দাতা রব হিসেবে মানত। তার প্রমাণ কুরআনের আয়াত যেখানে ইবলিস আল্লাহতায়ালাকে বলেছে : সে (ইবলিস) বললোঃ **"হে আমার রব! তুমি যেমন আমাকে বিপথগামী করলে ঠিক তেমনিভাবে আমি পৃথিবীতে এদের জন্য প্রলোভন সৃষ্টি করে এদের সবাইকে বিপথগামী করবো।" (সূরা হিজরঃ ৩৯)** অর্থাৎ ইবলিস আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে মানত।

দুইঃ ইবলিস জান্নাত, জাহান্নাম ফেরেস্তা আখেরাত এ বিশ্বাস করত। এর দলিল ইবলিসকে যখন আল্লাহর হুকুম অমান্যর কারণে [আদম (আঃ) কে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল] অভিশপ্ত কাফের ঘোষণা দেওয়া হল তখন ইবলিস কেয়ামত পর্যন্ত সময় চাইল আল্লাহতায়ালার কাছে, যেন সে মানুষকে পথভ্রষ্ঠ ও গোমরাহ করে তার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। তার প্রমাণ ইবলিস আরয করলো, **"হে আমার রব! যদি তাই হয়, তাহলে সেই দিন**

পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও যেদিন সকল মানুষকে পূণর্বার উঠানো হবে ।"[আল-হিজরঃ ৩৬-৩৭]

তিনঃ হাদীসের দলিল থেকে আমরা জানতে পারি, ইবলিস আল্লাহ তায়ালার বহু ইবাদত করেছে এবং সে অনেক বড় আলেম ছিল । কিন্তু তার এ ইলম এবং ইবাদত কোন কাজেই আসেনি যখন সে আল্লাহতায়ালার হুকুমকে অমান্য করে নিজের নফসের ইচ্ছা মত কাজ করল ।

চারঃ এবার লক্ষ্য করুন আল্লাহতায়ালাকে বিশ্বাস, আখেরাতে বিশ্বাস এবং আল্লাহতায়ালার অনেক ইবাদত করার পরেও ইবলিস আল্লাহর একটি হুকুম (আদমকে সিজদা করা) পালনে অস্বীকার করার কারনে আল্লাহতায়ালা নিজে তাকে কাফের ডেকেছেন এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হিসেবে তার পরিণতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন । যে সকল অপরাধের কারণে ইবলিস কাফের হল ঃ

(ক) ইবলিস শয়তান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছে বুঝে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে,

(খ)সে নিজেকে বড় এবং উত্তম মনে করেছে,

(গ) সে অহংকার করেছে,

(ঘ) আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজস্ব মনগড়া যুক্তি বা লজিক (Logic) পেশ করেছে । যুক্তিটি ছিল– সে ইবলিশ আগুনের তৈরি আর আদম (আঃ) শুকনো টনটনে পচা মাটি দ্বারা সৃষ্ট । আগুন মাটি থেকে শ্রেষ্ট- এ মানদন্ড ইবলিশ তার নফস থেকে তৈরি করেছিল অথচ যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার মানদন্ডে আগুন মাটি থেকে শ্রেষ্ঠ নয় । আগুনের তৈরি ইবলিশ তাই মাটির তৈরী আদম (আঃ) কে কিভাবে সিজদা করবে । অথচ আল্লাহ তায়ালা আদমকে (আঃ) সিজদার হুকুম করার পূর্বে আদম (আঃ) যে জ্ঞান ও বুদ্ধির দিক থেকে ফেরেশতা ও ইবলিসের থেকে শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণিত করেছিলেন । কিন্তু ইবলিশ নিজের নফসের দাসত্ব করেছে আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছে ।

(ঙ) এই অপরাধের জন্যে সে মোটেও অনুতপ্ত হয়নি এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করেনি । অপর পক্ষে,

আদম (আঃ) ইচ্ছাকৃতভাবে বুঝে শুনে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেননি -

১. তিনি বিদ্রোহও করেননি , ২. অহংকারও করেননি, ৩. তিনি অপরাধ করেছেন ধোকায় পড়ে ভুল করে , ৪.. তিনি সচেতনভাবে মূলত আল্লাহর একান্ত ই অনুগত ছিলেন এবং ৫. ভুল বুঝবার সাথে সাথে অনুতপ্ত হন । আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন ।

একজন মুমিন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য এটাই যে, তার ভুলের জন্য অনুতপ্ত হবে ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে ।

অতএব বর্তমানে যারা ইবলিসের ন্যায় আল্লাহকে রব হিসেবে মানে এবং আল্লাহর কিছু কিছু ফরজ হুকুম পালন বা ইবাদত করে কিন্তু আল্লাহর নাযিলকৃত যে কোন একটি হুকুমকে মানতে অস্বীকার করে তারা নিঃসন্দেহে কাফের ।

যেমন বর্তমান দিনে বহু সংখ্যক লোক আছে যারা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, নামক ইবাদত সমূহ পালন করছে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আল্লাহ যে সকল আইন দিয়েছেন তা তারা মানতে নারাজ এবং আল্লাহর আইনের তুলনায় মানুষের দ্বারা লিখিত আইনকে তারা বেশি ভাল এবং যুগ উপযোগী বলে মনে করে এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানুষের তৈরী করা আইনকেই প্রয়োগ করে । মানুষের তৈরী করা সংবিধান দ্বারা বিবাদ পূর্ণ বিষয়ের (ফৌজদারী মামলা সমূহ) বিচার ফয়সালা করে । তারা নিঃসন্দেহে কাফের ।

" যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের ।----- যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালেম ।----- যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই ফাসেক ।" [মায়েদা ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭],

" না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের নামের শপথ, ইহারা কিছুতেই ঈমানদার হইতে পারে না, যতক্ষন না তাহারা তাহাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপার সমূহে তোমাকে বিচারপতি রূপে মানিয়া লইবে । অতঃপর তুমি যাহাই ফায়সালা করিবে সে সম্পর্কে তাহারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিবে না, বরং উহার সম্মুখে নিজদিগকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করিয়া দিবে ।"(নিসা ঃ ৬৫)

তৃতীয় প্রকার কাফের ঃ

আহলে কিতাব বা ইহুদী এবং খৃষ্ঠানরা (নাসারা) আল্লাহতে বিশ্বাস করে এবং 'গড' বলে ডাকে । তারা পূর্ববর্তী নবীদেরকে যথা আদম (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), জাকারিয়া (আঃ) মুসা(আঃ), ঈসা (আঃ), কে নবী বলে মানে [ইহুদীরা ঈসা(আঃ) ছাড়া উনার পূর্বের সকলকে নবী মানে] । তারা জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেস্তা, আখিরাতের উপরও ঈমান আনে । কিন্তু তাদের প্রধান দুইটি কুফরী কাজের জন্য আল্লাহতায়ালা তাদেরকে কাফের বলেছেন ।

তাদের প্রথম কুফর হোল, শিরক মিশ্রিত আকিদা । খৃষ্ঠানরা ঈসা (আঃ) কে আলাহর পুত্র এবং মারইয়াম (আঃ) কে আল্লাহর স্ত্রী (নাউযুবিল্লাহ)সাব্যস্ত করে তিন ইলাহ গ্রহণ করেছে । অপরদিকে ইহুদীরাও আল্লাহর নবী উযাইর (আঃ) এর প্রকৃত শিক্ষা বর্জন করে তাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে(নাউযুবিল্লাহ) । আল্লাহতায়ালার একত্ববাদের কথা জেনেও তারা এ সকল শিরকে লিপ্ত হয়ে কাফেরে পরিণত হয়েছে । অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এরশাদ করেছেনঃ

"হে নবী! বলঃ তিনি অর্থাৎ আল্লাহ একক, অমুখাপেক্ষী, তার কোন সন্তান-সন্ততি নেই, আর তিনি কারো সন্তান নন, আর কেউই তাঁর সমতুল্য নয় ।"[সূরা ইখলাস]

দ্বিতীয় প্রকার কুফরীর ধরন, ইহুদী এবং খ্রীষ্ঠানরা শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এবং উনার উপর নাযিলকৃত শেষ আসমানি কিতাব 'আল কুরআন' কে এবং রাসূল(সাঃ) প্রদর্শিত শরীয়তকে মেনে নিতে তারা অস্বীকার করেছে । এ জন্য তারা কাফের । তাদের জন্য যে সকল আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছিল

এবং তাদেরকে যে শরিয়ত দেয়া হয়েছিল তা ইহুদী খৃষ্ঠানরা নিজেরাই অমান্য করা শুরু করেছিল এবং কিতাবগুলিকে অনেকাংশে বিকৃত করে ফেলেছিল। অতঃপর আল্লাহতায়ালা শেষ নবী রাসূল মুহাম্মদ(সাঃ) কে কুরআন আর সুন্নাহর মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শরিয়ত এবং কর্মপন্থা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের ও জ্বীনদের জন্য। পূর্বের নবীদের উম্মতের উপর নাযিলকৃত সকল শরিয়ত ও কর্মপন্থা বাতিল ঘোষণা করেছেন কুরআন সম্পূর্ণ নাযিলের পর। এখন যে কেউ এটাকে অস্বীকার করবে সে হাক্কানী কাফের। তাদের কাফের হওয়ার বিষয়ে যদি কোন মুসলিম নামধারী লোক সন্দেহ করে সেও কাফের। এরশাদ হচ্ছে ঃ

"আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।" (সূরা বাইয়্যেনাঃ ০৬)

চতুর্থ প্রকার কাফের ঃ

মুশরিক কাফের–এই ধরনের কাফের যেমন বিধর্মী জাতিগুলির লোকসকল তেমনি মুসলিম সমাজে মুসলিম নামধারী এ ধরনের কাফের আজ চারিদিকে। এরা হল সেই কাফের যারা– আল্লাহতায়ালার রুবুবিয়্যাত (রব হিসেবে তাঁর যে সকল বৈশিষ্ট্য ও কাজ সমূহ) ও উলুহিয়াতে(ইলাহ হিসেবে একমাত্র ইবাদত পাওয়ার সর্বময় অধিকারী) আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে শিরক করে। এদের অপর নাম মুশরিক। শিরক দুনিয়ার বুকে সবচাইতে জঘন্য অপরাধ। আর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কুরআনে বহু আয়াতে সুস্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন উনি শিরকের গুনাহ কোন দিনও ক্ষমা করবেন না।

"আল্লাহ্ কেবল শের্কের গুনাহই মাফ করেন না; ইহা ব্যতীত আর যত গুনাহ আছে তাহা যাহার জন্য ইচ্ছা মাফ করিয়া দেন। যে লোক আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিল; সে তো বড় মিথ্যা রচনা করিল, এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করিল।" [আন- নিসা ঃ ৪৮]

"যদি তারা শির্ক করে তাহলে তাদের সমস্ত ভাল 'আমল বরবাদ হয়ে যাবে"।

(সুরা আল-আন'আম ঃ ৮৮)

সূরা আনআমে ৮২-৮৮ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ১৮ জন নবীর নাম নিয়ে বলেছেন যে এরাও যদি শির্ক করত তাহলে তাদের সমস্ত আমল ব্যর্থ হয়ে যেত। আখেরাতের আদালতে কোন মুসলিম ব্যক্তি যত বড় গুনাহ করুক না কেন মহান আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে মাফ করতে পারেন। কিন্তু শিরকের গুনাহ্ তিনি কখনই মাফ করবেন না। কোন ব্যক্তি যত বড় নেককার ও যত বড় আমলদার হোক না কেন শির্কের কারণে তার সমস্ত আমল ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেননা আল্লাহ্ সুবহানু ওয়া তায়ালা নবীদেরকেও এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অব্যাহতি দেননি। কারণ রাসূল (সাঃ)-কেই কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলে দিয়েছেনঃ

"তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে গত হওয়া সমস্ত নবী-রসূলদের প্রতি এই অহী পাঠানো হইয়াছে যে, তুমি যদি শির্ক কর, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার আমল নষ্ট হইয়া যাইবে, আর তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে (জাহান্নামে যাবে)।" [যুমার ঃ ৬৫]

ভেবে দেখুন রাসূল (সাঃ)-এর চেয়ে বেশী আমল তার উম্মতের মধ্যে থেকে কেউ কি করতে পেরেছে না পারবে। অথচ রাসূল (সাঃ) কেও আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জানিয়ে দিলেন তিনিও যদি শিরক করেন তবে তার আমল সমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব ভাই শির্ক হল এমন এক বিষয় যা দুনিয়া ও আখেরাত বিনষ্ট করে দেয় আর শির্কযুক্ত আমলের কোন মূল্য নেই কারণ শিরক করার কারণে জান্নাত হারাম হয়ে যায়।

বস্তুত আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও যে শরীক করিয়াছে আল্লাহ্ তাহার উপর জান্নাত হারাম করিয়া দিয়াছেন। আর তাহার পরিণতি হইবে জাহান্নাম। এই সব যালেমদের কেহই সাহায্যকারী নাই।" [আল-মায়েদা ঃ ৭২]

শিরক করে তওবার মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন না করে কেউ যদি মারা যায় তবে তাকে কখনও আর জাহান্নাম থেকে উঠানো হবে না এবং পরিনাম তার জাহান্নাম আর জাহান্নাম। কোন দিন মাফ পাবে না।

উলা-ইকা আছহা-বুন্নার, হুম ফীহা-খালিদুন **"ওরাই দোযখবাসী, সেখানে তারা অবস্থান করিবে চিরকাল।** (বাকারা ২৫৭)

শিরক কাকে বলে তা জানা আমাদের জন্য ফরজ। (কিভাবে শিরক হয় যদি না জানি তবে) শিরক থেকে বাচবো কিভাবে।

শিরক

শির্ক অর্থ হচ্ছে অংশীদার স্থাপন করা। শরীয়তের পরিভাষায় শির্ক হলো যে সব গুণাবলী কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট, সে সব গুণে অন্য কাউকে গুণান্বিত ভাবা বা এতে অন্য কারোর অংশ আছে মনে করা।

আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন জঘন্য অপরাধ । যে ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে বা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে সে ব্যক্তি মুশরিক বলে গণ্য হবে । এমন ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য এবং তার কোন প্রকার সৎকর্মই গ্রহনযোগ্য হবে না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে হুশিয়ার করে বলেছেন, **"সাবধান! আলাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না,যদিও তোমাকে এজন্য কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয।"**(ইবনু মাজাহ)

অংশীদার স্থাপন কখন প্রয়োজন হয় ঃ অংশীদার স্থাপন করা তখনই প্রয়োজন হয় যখন কারো মাঝে কোন কিছুর অপূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কেউ ব্যবসায়ে কাউকে পার্টনার বা অংশীদার করতে চাইলে এ জন্যই করে যে, হয়তো তার কাছে টাকা আছে কিন্তু দক্ষতা নেই বা দক্ষতা আছে কিন্তু টাকা নেই বা টাকা ও দক্ষতা উভয়ই আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম বিধায় সে ব্যবসা করতে সক্ষম নয় ইত্যাদি। এক কথায় সে নিজের মধ্যে কোন অপূর্ণতা লক্ষ্য করেছে যা পূর্ণ করার জন্য তার অংশীদার প্রয়োজন হয়ে দাড়ায়। আল্লাহ কি অপূর্ণাঙ্গ (নাউযুবিলাহ)? এর উপযুক্ত জবাব স্বয়ং আলাহ তায়ালাই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

"আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সব কিছু রক্ষণাবেক্ষণ করেন।"

(আয যুমার ঃ ৬২)

"যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু এতটুকুই বলেন যে, হও, আর অমনিতেই তা হয়ে থাকে।" **(আল বাকারা ঃ ১১৭)**

"তাঁর ক্রিয়াকলাপের কৈফিয়ত কাউকে দিতে হয় না।" **(সূরা আম্বিয়া)**

"তিনি রাজত্ব করেছেন, তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ বিবেচনা করার কেউ নেই"(রাদ ঃ ৪১)

শিরক কেন এত ভয়াবহ ঃ শিরক হচ্ছে মূলত আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদারিত্বের আকীদা পোষণ করা। শিরকের মাধ্যমে আল্লাহর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করা হয়। এ কারণেই শিরক জঘন্যতম অপরাধ। কিছু বিষয় আছে যা কিনা আপনি নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে শরীক করা পছন্দ করবেন না। আপনার স্ত্রী যদি বলে "তুমিও আমার স্বামী এবং সেও (অপর কোন লোককে)" তবে আপনার কি অবস্থা হবে একটু চিন্তা করুন। আমরা নিজের জন্য জীবনে অনেক বিষয়ে শরীক করা সহ্য করি না অথচ আল্লাহ তায়ালা যে সকল বিষয়কে নিজের জন্য খাস করেছেন যেমন আইন দেয়া, হালাল হারামের বিধান দেয়া, কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক বিচার ফায়সালা করা, আল্লাহর নাজিল করা আইন দিয়ে দেশ রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালিত করা ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর সাথে আমরা মানুষের তৈরি করা আইন, সংবিধান ও সংসদকে মেনে নিয়ে শরিক করছি।

অন্যান্য কবিরাগুনাহে আল্লাহর সাথে শরীক করা হয় না। সেখানে হয় আদেশ লংঘন। এ ধরনের একজন অপরাধী শয়তানের প্ররোচনায় এবং নাফসের তাড়নায় আল্লাহর কোন নিষেধকে যখন লংঘন করে তখনো সে আল্লাহর নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের বিশ্বাস পোষণ করতে পারে। কিন্তু যে শিরক করে সে কখনো নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী হতে পারে না। যদি তাই হতো তাহলে সে শিরক করতে পারতনা। শিরক ও অন্যান্য গুনাহের মধ্যে এটাই মৌলিক পার্থক্য। আরেকটি পার্থক্য হল অপরাপর কবিরাগুনাহে গুনাহগারের মনে অপরাধবোধ থাকে। এ অপরাধবোধ এক সময় তাকে অনুতপ্ত করে তোলে, ফলে সে তাওবা করে। সকল ধরনের কবিরা গুনাহের ক্ষেত্রেই এ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শিরকের

ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা নেই। যে শিরক করে তার মধ্যেতো অপরাধ বোধ সৃষ্টি হওয়ার কোন সুযোগ নেই। সেতো শিরক করে থাকে নেক বোধ (!) নিয়ে। তার বিশ্বাস সে যা করছে তাতে তার দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ হবে। যে মদপানকরে সে জানে যে সে মদ পান করে। যে ব্যাভিচার করে সে জানে সে ব্যাভিচার করে। যে মিথ্যা বলে সে জানে যে সে মিথ্যা বলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে শিরক করছে, সে জানেনা যে সে শিরক করছে। ফলে তার মধ্যে কখনো পাপবোধ সৃষ্টি হয় না। কখনো সে মনে করে না যে সে এমন একটি কাজ করে যাচ্ছে যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট। তার ধারণা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শিরককারীরা তাওবা করার সুযোগ পায় না। আর এ অবস্থায় তাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

ইসলাম গ্রহণ করার পর কোন শিরককারীর 'আমল আল্লাহ কবুল করবেন না।

(সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহা-৬ষ্ট খন্ড ৮৪৮ পৃষ্টা)

বিধর্মীদের শির্কের ধরন

রাসূল (সাঃ) এর সময় কুরাইশ বংশের কাফেররা মূলত আল্লাহর সাথে নানাবিধ শরিক নিয়ে মুশরিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। অনেকেরই ভুল ধারণা আছে কুরাইশ কাফেররা বোধহয় আল্লাহ যে একজন 'রব' আছেন তা স্বীকার করতো না। এটা ভুল ধারণা । কুরাইশ কাফেররাও আল্লাহ্কে মানতো। তার সবচেয়ে বড় প্রমান তারা নাম রাখত আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র দাস "SLAVE OF ALLAH'। আল্লাহ্ আছেন এ কথা না মানলে কেউ আল্লাহ্র দাস নাম রাখতে পারে না। এছাড়াও কুরআনে পাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসূল (সাঃ) কে বলেছেন কুরাইশ কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করতে।

"আপনি জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও যমীন থেকে তোমাদেরকে কে রিযিক দান করেন, কিংবা তোমাদের কান ও চোখের মালিক কে? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন, আবার কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন, তখন তারা বলে উঠবে, 'আল্লাহ্'। তখন আপনি বলুনঃ তারপরও তোমরা তাঁকে ভয় করছোনা কেন?"

(ইউনুছ ঃ ৩১)

অর্থাৎ তারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করতো এবং আল্লাহ্র মূল গুণাবলীকে স্বীকার করতো। কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে কাফের বলেছেন। কারণ তারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করতো এবং সাথে সাথে আল্লাহ্র সাথে শরিক সাব্যস্ত করতো। তাই এদের অপর নাম মুশ্রিক।

বিধর্মী মুশরিকরা বিভিন্নভাবে আল্লাহর তা'আলার সাথে অংশীস্থাপন করেছে। তাদের মধ্যে হিন্দুদের শিরকের ধরন এতই আশ্চর্য যে, তারা একটি দু'টি নয়, তেত্তিশ কোটি দেবতা গ্রহণ করেছে। আল্লাহর সৃষ্টি পাথর, গাছপালা, গরু-বাছুরকেও তারা মহান প্রতিপালকের সাথে আসনে বসাতে দ্বিধাবোধ করেনি । অপরদিকে বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরাও গৌতম বুদ্ধের মূর্তিকে রূপক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের শিরকের ধরন পূর্বে আলোচনা করেছি। এভাবেই কাফির মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার সাথে একের পর এক অংশীদার স্থাপন করে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহর একত্ববাদের কথা জেনেও তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।

মুসলমান কিভাবে মুশরিক হয় ঃ

অন্যান্য জাতি যেমন শিরকের কারণে মুশরিক হয়েছে তেমনি কোন মুসলমান শিরক করলে সেও মুশরিক বলে গণ্য হবে। শিরকের কারণে মুসলমানদের মুশরিক হবার কথা আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন-

"অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে বটে কিন্তু সাথে সাথে তারা মুশরিকও।" (ইউসুফ ঃ ১০৬)

এর দ্বারা বুঝা গেল, মুসলমানদের দ্বারাও শিরক সংঘঠিত হচ্ছে। তবে অমুসলিমদের মত কাউকে আল্লাহর পুত্র বা স্ত্রী সাব্যস্ত করে নয় বরং ভিন্ন কায়দায়। যেমন-

(ক) কবর পূজা, মাজার পূজা, পীর পূজা এবং তাদের নামে মানৎ যবেহ

(খ) মানুষের আইন রচনার অধিকার আছে বলে স্বীকার করা ও মানুষের তৈরী আইন মেনে নেয়া।

(গ) জনসাধারাণকে সকল ক্ষমতার উৎস বলে আখ্যায়িত করা।

(ঘ) মূর্তি-ভাস্কর্য তৈরি করা, আগুনকে সম্মান দেখানো।

(ঙ) তাবিজ ব্যবহার করা, তাবিজকে বিপদের রক্ষাকারী মনে করা।

(চ) কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আক্বীদা পোষণ করা।

(ছ) মানুষ বা জীনকে গায়েব জানে বলে মনে করা।

(জ) কাউকে পৃথিবীতে যা ইচ্ছে করার অধিকারী ভাবা।

(ঝ) আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত আইন বাদ দিয়ে মানুষের দ্বারা রচিত আইনে বিচার করা এবং মানুষের তৈরিকৃত আইনের কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়া।

মুরতাদ

"তোমাদের মধ্যে যে সব লোক নিজের দীন থেকে সরে যাবে আর দীনত্যাগী অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাদের সব নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা জাহান্নামবাসী এবং সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে।" (আল-বাকারা ঃ ২১৭)

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনলো, অতঃপর কুফরী করল, পুনরায় ঈমান গ্রহণ করল, পুনরায় আবার কুফরী করল, অতঃপর কুফরী আক্বীদা বিশ্বাস ও কর্মকান্ড বাড়তেই থাকলো। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ক্ষমা করবেন না এবং কখনো তাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখাবেন না।" (আন-নিসা ঃ ১৩৭)

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা সেই বান্দার তাওবাহ কবুল করেন না, যে ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী প্রকাশ করে। (আহমাদ, সনদ সহীহ)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অন্ধকার রাতের মত ফিতনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হলে (কুফরী করে) বিকেলে কাফির হয়ে যাবে। বিকেলে মু'মিন হলে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দীন বিক্রি করে বসবে। (মুসলিম কিতাবুল ঈমান)

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলো যে, মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। আবার মুসলমান হবার পর কুফরী করলে সে কাফির হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তার দীন ও ঈমানকে প্রত্যাহার করে কাফির হয় শরীয়তের পরিভাষায় তাকেই মুরতাদ বলা হয়।

ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত, অপরিহার্যভাবে মেনে চলার জন্য নির্ধারিত এক বা একাধিক বিষয়কে অস্বীকার করলে মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায়। যে মুসলিম ব্যক্তি ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক অপরিহার্যরূপে মেনে চলার জন্য নির্ধারিত কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করলো বস্তুত সে আল্লাহর কিতাবের অংশ বিশেষের প্রতি ঈমান আনলো আর অস্বীকার করলো অংশ বিশেষকে এমতাবস্থায় সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত বলেই গন্য হবে। অর্থাৎ সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

মুসলিমদের এবং খারেজীদের আকীদার পার্থক্য

আমাদের আক্বিদার একটি বিষয় জানা সকলের জন্য অত্যন্ত জরুরী। আর তা হল, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে গুনাহ এমন কি কবীরা গুনাহ সমূহ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে সে কাফির বা মুরতাদ হয়ে যায় না। এটা খারিজিদের আকীদা যে কেউ কবীরা গুনাহ করলে কাফের হয়ে যায়। একটি আয়াতের উদাহরণ দিলে ইনশাআল্লাহ ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

"(হে বিশ্বাসীগণ) আর যে জন্তু আল্লাহর নামে যবেহ করা হয় নাই তাহার গোশত খাইওনা। তাহা খাওয়া ফাসেকী (একটি গুনাহ এবং আলাহর অবাধ্যতা) কাজ। শয়তানেরা নিজেদের সংগী-সাথীদের (মানুষের মাঝে) মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উন্মেষ করে, যেন তাহারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি তাদের আনুগত্য স্বীকার কর [by making Al-MAITAH (a dead animal) legal by eating] তবে নিশ্চতই তোমরা মুশরেক।" (আল-আনআম ঃ ১২১)

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে দেখতে পাই, হারাম গোশত খাওয়ার একই অপরাধের জন্য একজনকে আল্লাহ তায়ালা গুনাহগার বলেছেন এবং অপরজনকে মুশরিক বলেছেন। তার অর্থ দাড়ায়, আল্লাহর হারাম করা কোন খাদ্যকে কেউ যদি হারাম জেনে এবং মেনে খায় তবে সে কবীরা গুনাহ করল। কিন্তু তার পরেও সে মুসলিম থাকে। এ অপরাধের জন্য জাহান্নামে আল্লাহর ইচ্ছামত শাস্তি ভোগ করতে হবে অথবা কেউ তওবা করলে আল্লাহ শাস্তি নাও দিতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর হারাম করা খাদ্যকে হারাম না মানে অর্থাৎ যদি সে নিজের নফসের ইচ্ছায় বা কারো কথায় এ আকিদা পোষণ করে যে, আল্লাহ হারাম করেছেতো কি হয়েছে আমি মনে করি হালাল তবে সে মুশরিক কাফেরে পরিণত হবে। উদাহরণ কেউ মদ পান করার সময় এই চিন্তা করে পান করল যে, আমি জানি মদ হারাম কিন্তু আমার পান করতে ইচ্ছে করছে তাই পান করছি তবে সে কবীরা গুনাহ করল। আবার আরেকটা লোক মদ পান করে না কিন্তু সে এই আকিদা পোষণ করে "আমি মদ খাওয়াকে হারাম মানিনা" তবে সুনিশ্চিত সে মুশরেক কাফের। এই ব্যক্তির মদকে হালাল বলার পিছে যদি নিজের নফস কাজ করে তবে নফস তার ইলাহতে পরিণত হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি, নেতা, পন্ডিত, আলেমের কথায় যদি আল্লাহর হারাম করা যে কোন কিছুকে হালাল মনে করে কিংবা আল্লাহর হালাল করা কোন কিছুকে হারাম মনে করে তবে যার কথাকে সে আল্লাহর হুকুমের উপরে স্থান দিল সে ব্যক্তি, পন্ডিত, নেতা বা আলেম তার ইলাহতে পরিণত হবে আল্লাহর জায়গায়। অতএব সে আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করে মুশরিকে পরিণত হবে।

তবে এ উদাহরণ শিরকের ক্ষেত্রে ভিন্ন। অর্থাৎ কেউ যদি আল্লাহর সাথে শরিক হয় এমন যে কোন কাজ শিরক জেনে ও মেনে করল তবে সে সাথে সাথে ইসলাম থেকে বের হয়ে মুশরিকে পরিণত হবে। অর্থাৎ শিরক এমন একটি গুনাহ যা কিনা জেনে করলেও যা, না জেনে করলেও একই অপরাধ। আর আল্লাহ তায়ালা শিরকের অপরাধ তওবা করে বিরত না হয়ে মারা গেলে কোন দিন ক্ষমা করবেন না। যেমন ধরুন, আপনি যে কোন অপরিচিত পরিবেশে বা ভিন্ন দেশে গেলেন। সেখানে আপনার দ্বারা কোন ব্যক্তি খুন হয়ে গেল। যদি আপনি তখন সেখানকার আদালতে বলেন, মানুষ খুন করা অপরাধ আপনি জানতেন না; তবে কি তারা আপনার দ্বারা সংঘটিত খুনের এ অপরাধ ক্ষমা করে দেবে? কখনও নয়, কারণ খুন করা যে অপরাধ আপনি সেদেশে যেয়ে নিজের প্রয়োজনে জেনে নিতে হবে। ঠিক তেমনি আল্লাহ তায়ালার দুনিয়াতে এসেছেন। এখানে আল্লাহ তায়ালার রুবুবিয়্যাতের সাথে (রব হিসেবে যে সকল বৈশিষ্ট শুধুমাত্র উনার একার) শিরক করার অপরাধ কোনদিনও ক্ষমা করা হবে না বলে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব নিজের প্রয়োজনে শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা এবং শিরক থেকে বেচে থাকা আপনার আমার প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। ভ্রান্ত মুর্জিয়া আকিদার লোকেরা মনে করে শিরক না জেনে বা জেনে করেও একজন মুসলিম ইসলামে থাকে। তারা শিরকের অপরাধের

সাথে অন্যান্য কবিরাগুনাহ সমূহ মিশ্রিত করে ফেলেছে এ উপমহাদেশে এ ভ্রান্ত আকিদা খুবই প্রচলিত। তাই মানুষ কবিরা গুনাহ করলে তা খুবই খারাপ নজরে দেখা হয় কিন্তু শিরক করলেও তার বিরুদ্ধে কোন সতর্কতা ও প্রতিবাদ নেই বললেই চলে।

উদাহরণ কোন ব্যক্তি জানে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। আইন দানের ক্ষমতা একমাত্র আলাহর। এটা জেনে এবং মেনেও নিজে আইন রচনা করল কিংবা যে সকল ব্যক্তিবর্গ আইন রচনা করল তাদেরকে এবং তাদের তৈরি করা আইনকে মানল। মানুষের তৈরি করা আইনের কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়া শিরকে আকবর জেনেও কুফর আদালতে বিচার ফায়সালার জন্য গেল, তবে সে মুশরিকে পরিণত হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহ আইন দাতা অন্তরে এ বিশ্বাস তার কাফের হওয়াকে আটকাতে পারবে না। কারণ আমরা জানি ঈমান তিনটি বিষয়ের সাথে সংযুক্ত। (১) অন্তরের বিশ্বাস (২) মুখের স্বীকৃতি এবং (৩) নেক আমল।

১) অন্তরের বিশ্বাস ঃ

এটা ঈমানের মূল বিষয়। কারণ কোন ব্যক্তি যদি মুখে কালেমার ঘোষণা দেয় এবং আমলে আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করে কিন্তু অন্তরে আল্লাহ এবং রাসূলকে অপছন্দ করে বা অস্বীকার করে কিংবা আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) যে শরীয়ত দিয়েছে তা মানতে অসন্তুষ্ট তবে সেই লোক মুনাফিক এবং তার স্থান হবে চিরকালের জন্য জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অর্থাৎ জাহান্নামে কাফেরদেরও নীচে।

২)মুখের স্বীকৃতি ঃ

কার অন্তরে কি আছে তা আমরা খোজ করতে যেতে পারি না। অন্তরের খবর আল্লাহ জানেন। আমরা কোন মানুষকে মুসলিম কিনা যাচাই করবো তার মুখের ঘোষণা এবং নেক আমলের দ্বারা। মুখের ঘোষণা এবং আমল বা কাজ যদি শরীয়ত মুতাবেক হয় তবে কাউকে সন্দেহ করে মুনাফিক ডাকতে নিষেধ করেছেন রাসূল (সাঃ)। কিন্তু কেউ যদি কোন জবরদস্তি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় মুখে কুফর ঘোষণা দেয় আর বলে আমার অন্তর ঠিক আছে তবে অবশ্যই তাকে আমাদেরকে কাফের বিবেচনা করতে হবে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা সূরা তওবাতে উল্লেখ করেছেন।

"বল, তোমাদের হাসি-তামাসা ও মন-মাতানো কথাবার্তা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াত এবং তাঁর রসূলের ব্যাপারেই ছিল? এখন টাল-বাহানা করিও না। তোমরা ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করেছ ..." (আত-তওবাহ ঃ ৬৫-৬৬)।

"তারা অবশ্যই কুফরী কথা বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী করেছে।"

(আত-তাওবাহ ঃ ৭৪)

এখানে আল্লাহ এবং তার রাসূল (সাঃ) কে নিয়ে হাসি ঠাট্টা কথা বার্তা বলার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কাফের ঘোষণা দিয়েছেন।

৩। আমল বা আল্লাহর হুকুমসমূহ কাজে পরিণত করা ঃ

কেউ যদি মুখে ঘোষণা দেয় এবং বলে অন্তর ঠিক আছে কিন্তু আমল করে না সেক্ষেত্রে কি হবে তা জানা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি কাফেররা ও ইবলিশ আল্লাহকে রব মানে কিন্তু আল্লাহকে রব মানলেই কেউ মুসলিম হয় না যতক্ষণ না আল্লাহকে ইলাহ মানা হয়। অর্থাৎ ইলাহ তিনিই শুধুমাত্র যার হুকুমের অনুসরণ (ইবাদত) করা হয়। তাই আলাহ তায়ালা মুসলিম হওয়ার জন্য কালেমার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ঘোষণা দিতে বলেছেন তাতে প্রথমেই বলেছেন কোন ইলাহ নাই আল্লাহ ছাড়া। অর্থাৎ আমাদের আমল হবে শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুমের মোতাবেক আর কারও হুকুম অনুসরণ করা যাবে না উনার হুকুমের বদলে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, ইসলাম শুরুই হয় মুখের ঘোষণা আর ঘোষণাকে আমলে পরিণত করার মাধ্যমে। যেমন ধরুন কোন মুসলিম ব্যক্তি কালেমাহ শাহাদাতাইন ঘোষণা দেয়ার পরে যদি নামায না পড়ে এবং যাকাত না দেয় অর্থাৎ মুখে নামায ও যাকাত স্বীকার করার পরও যদি আমলে পরিণত না করে তবে বেশীর ভাগ আলেমরা একমত ঐ ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায়। ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রে তাকে এক থেকে তিনদিন সময় দিয়ে তওবা করার সুযোগ দেয়া হয়। যদি সে তওবার মাধ্যমে নামায পড়া এবং যাকাত দেয়া শুরু না করে তবে তাকে মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু কেউ যদি রোযা না রাখে কিংবা সামর্থ হওয়ার পরও হজ্জে না যায় তবে তাকে বড় গুনাহগার হিসাবে চিহ্নিত করা যায় কিন্তু কাফের কিংবা মুরতাদ বলা যাবে না (বিস্তারিত জানার জন্য সূরা তওবা -৫ তাফসীর দেখুন)। আবার কোন ব্যক্তি জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার পরও জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে মুনাফেকে পরিণত হয়। উদাহরণ স্বরূপঃ

(ক) নামায অস্বীকারকারী -- আর নামায অস্বীকৃতি সম্পর্কে ইসলামী আইন বেত্তাগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো "যে ব্যক্তি নামাযের অপরিহার্যতায় অস্বীকার প্রসূত নামায বর্জন করলো সে মুরতাদ"।

(খ) যাকাত অস্বীকারকারী -- যাদেরকে স্বীয় খিলাফতকালে আবু বাকার সিদ্দীক (রাঃ) মুরতাদ ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। "কেন তিনি এ রকম ফায়সালা নিলেন যাকাত বাইতুল মালে দিতে অস্বীকারীদের বিরুদ্ধে (কারন তারা কালেমার ঘোষণা দেয় এবং সালাত আদায় করে)" এ প্রশ্ন ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেসা করলে আবু বকর (রাঃ) সূরার তওবার নিম্নোক্ত আয়াত দলিল হিসেবে পেশ করেন

"অতএব, হারাম মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে গেলে মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো এবং তাদের ধরো, ঘেরাও করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকো। তারপর যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তাহলে তাদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়"

(সূরা তাওবাহ ঃ ০৫)

অতএব কেউ অন্তরে বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে যদি মুখে কিংবা কাজে কুফরীর পথ

অবলম্বন করে তবে অবশ্যই সে ইসলামের গন্ডির বাইরে চলে যাবে এবং সেই অবস্থায় তার মৃত্যু হলে কাফের মুশরিকের মৃত্যু হবে। তবে কাউকে জোর করে অত্যাচার করতে করতে মৃত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং তখন তার মুখ থেকে অন্তরের বিশ্বাসের বিপরীত কোন কুফর কথা বা কাজ বের করা হয় যা কিনা রাসূল (সাঃ) এর সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) এর সাথে করা হয়েছিল তবে আশা করা যায় তাকে আল্লাহ মাফ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রেও কেউ যদি শিরক কুফর বলার চেয়ে মৃত্যুর পথ বেছে নেন তবে তার তাকওয়ার মান অবশ্যই অত্যন্ত মজবুত ও উচ্চ শিখরে অবস্থিত।

[বিঃ দ্রঃ হাদীসে যদি কোন কাজকে কুফর বলা হয় তবে সেই কাজটি সর্বোচ্চ কুফর (আল কুফর যেই কুফর কাজ দ্বারা মুসলিম ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়) নাও হতে পারে অর্থাৎ সেই কুফরী কাজটার মাধ্যমে একজন মুসলিম কাফের নাও হতে পারে। শুধুমাত্র তার ঐ কাজটা কুফর যা কিনা কবীরা গুনাহ। যেমন হাদীসে এসেছে যখন কোন মুসলিম মদ খাওয়া যেনা করা ইত্যাদি কুফর কাজসমূহ করে তখন তার ঈমান থাকে না। কিন্তু পূর্বে সূরা আল-আনাম ১২১ আয়াতের আলোচনা থেকে জেনেছি এ কুফর কর্মগুলি দ্বারা একজন মুসলিম কাফেরে পরিণত হয় না। (খারেজীদের আকীদা অনুযায়ী উক্ত কবীরা গুনাহ সমূহের কারণে মুসলিম কাফের হয়)। অর্থাৎ হাদীসে উল্লেখিত ঐ সকল কবীরা গোনাহ বা কুফর কর্ম দ্বারা একজন মুসলিম কাফের এ পরিণত হয় না। কিন্তু কোরআনে যে সকল কথা বা কাজকে কুফর বলা হয়েছে তা হল সর্বোচ্চ কুফর যার দ্বারা একজন মুসলিম কাফের এ পরিণত হয়।]

'যিন্দীক'

যে ব্যক্তি স্বীয় কুফরীর উপর ইসলামের লেবেল এঁটে দেয় বা ইসলামের সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয় এবং নিজের কুফরীটাকেই সঠিক ইসলাম বলে প্রমাণ করার চেষ্টা চালায় এবং মুসলিম জনগণকে বিভ্রান্ত করে ইসলাম থেকে বের করে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়।

মুরতাদের ব্যপারে তো শরীয়তের ফায়সালা যে, তাকে তওবার কথা বলা হবে। যদি সে তওবা করে নেয়, তা হলে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু যিন্দীকের ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহ) বলেন যে, তাকে তওবার সুযোগ দেওয়া হবে না। কেননা, সে 'যানাদাক্বাহ্' অর্থাৎ কুফরীকে ইসলামরূপে প্রমাণিত করার অপচেষ্টা করছে; যা ক্ষমারঅযোগ্য অপরাধ। এরূপ ব্যক্তি শুকরের গোশ্তকে খাসীর গোশ্ত বলে মুসলিম জনগণের মাঝে বিক্রয় করেছে, মদের উপর পবিত্র যমযমের লেবেল এঁটে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। তাই এমন জঘন্য অপরাধ ক্ষমা করা যায় না। বর্তমান সময়ে যিন্দীকের উদাহরণ হল ভন্ড নবীর দাবীদার মীর্জা গোলাম আহমদের অনুসারী কাদিয়ানীরা, আশেকে রাসূল (সাঃ)-এর দাবীদার সুফী পন্থী দেওয়ানবাগী ইত্যাদি। এরা শুধু মুরতাদই নয় বরং যিন্দীকও

তাগুত

তাগুত আরবী طغيان (তুগইয়ান) শব্দ থেকে উৎসরিত। যার অর্থ সীমালংঘন করা। এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই "তাগুত" যে, আল্লাহ্দ্রোহী হয়েছে এবং সীমালংঘন করেছে, আর আমাদের একমাত্র রব হিসাবে আল্লাহ তায়ালার যে সকল রুবুবিয়াত বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার যে কোন একটিকে নিজে পারে বলে দাবী করে কিংবা নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছে এবং এমন বিষয়ে নিজেকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানিয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস। অর্থাৎ তাগুত হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নিজেকে আল্লাহর সাথে শরীক করে আর মুশরেক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নিজেকে আল্লাহ তায়ালার সাথে শরীক করে না ঠিকই কিন্তু সে তাগুতকে আল্লাহ তায়ালার (যে কোন একটি কাজের বা বৈশিষ্টের) সাথে শরীক করে।

সুস্পষ্ট ভাবে তাগুতের অর্থ হচ্ছে, কোনো মাখলুক (আল্লাহ তায়ার সৃষ্টি) কর্তৃক নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়কে (আল্লাহ্র স্থলে) নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা ঃ

এক ঃ রব হিসেবে যেই কাজগুলি একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা সম্পন্ন করেন, আল্লাহ্র যে কোন সৃষ্ট জীব বা মানুষ যদি দাবী করে যে, সেই কাজ সমূহের যে কোন একটি সে নিজে করতে সক্ষম। যেমন– সৃষ্টি করা, রিজিক দান করা অথবা শরীয়ত (বিধান বা আইন) রচনা করা। অর্থাৎ কেউ যদি বলে, আমি সৃষ্টি করি আমি রিজিক দান করি, আমি বিধান রচনা করি সেই "তাগুত"।

দুই ঃ আল্লাহ্র যে কোন সৃষ্ট জীব-মানুষ কতৃক আল্লাহ্ তায়ালার কোনো সিফাত (বা গুণ) কে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা । যেমন এলমে গায়েব জানা। যদি কেউ তা করে (অর্থাৎ বলে আমি এল্মে গায়েব বা ভবিষ্যতে কি হবে জানি) তাহলে সে তাগুতে পরিণত হবে।

তিন ঃ যে কোন ইবাদত মাখলুক বা বান্দা কতৃক অন্য কোন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা । যেমনঃ দোয়া, মান্নত, নৈকট্য লাভের জন্য পশু জবাই, অথবা বিচার ফয়সালা চাওয়া। যদি (কোনো মাখলুক) এসব ইবাদত (নিজের জন্য) স্বীকার করে নেয় বা মেনে নেয় অর্থাৎ কোন মানুষ তার উদ্দেশ্যে সেজদা করল, তার উদ্দেশ্যে মান্নত করল, পশু জবাই করল, তার উদ্দেশ্যে বিপদ মুক্তির জন্য কিংবা যে কোন কিছু পাওয়ার আশায় দোয়া করল এবং সে (উক্ত মাখলুক) এ সকল বিষয় নিজের জন্য মেনে নিল, তাহলে সেই তাগুত। ব্যক্তির নীরবতা বা ইবাদত গ্রহনে অস্বীকার না করাও স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য হবে যদি না সে এ

অবস্থা থেকে নিজেকে পবিত্র অথবা মুক্ত করে নেয়। অর্থাৎ যদি সে এ কথা না বলে যে এ অধিকারগুলি আল্লাহর জন্য খাস। এগুলি তোমরা আমাকে উদ্দশ্যে করে করতে পার না। যেমন ঈসা (আঃ) কে খৃষ্টানরা 'গড' এর পুত্র বলে সাব্যস্ত করে (নাউযুবিল্লাহ) উনার ইবাদত করে। কিন্তু ঈসা (আঃ) শেষ বিচারের দিনে এ ভ্রান্ত আকিদা কে অস্বীকার করবেন। কুরআনে এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে -

"আল্লাহ তায়ালা যখন বলবেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়াম, তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত করো? ঈসা বলবেন আপনি পবিত্র। (নবী বললেন) আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের খোজ খবর নিয়েছি। তারপরে যখন আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিলেন, তখন আপনি (আল্লাহ্) তাদের খোঁজ খবর রেখেছেন। আপনিই সব কিছুরই খবর রাখেন।" (সূরা আল মায়িদা ঃ ১১৭)

অতএব ঈসা (আঃ) তাগুত হওয়ার পরিণতি থেকে বেচে গেলেন।

উপরোক্ত যে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়কে যদি কেউ নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে তাহলে সে তাগুত হিসেবে গণ্য হলো এবং নিজেকে আল্লাহ্র সমতুল্য বলে সাব্যস্ত করে নিলো।

ইমাম মালেক (রহঃ) তাগুতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ এমন প্রতিটি জিনিসকেই তাগুত বলা হয়, আল্লাহ্ তায়ালাকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয়। আল্লাহ্ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয়, এমন সব কিছুই এ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। যে সব মাবুদ (উপাস্য) কে তাগুত হিসেবে গণ্য করা হয় সে গুলোর মধ্যে রয়েছে মূর্তি, এমন সব কবর, গাছ, পাথর ও অচেতন পদার্থ যেগুলোর উপাসনা করা হয়। আল্লাহ্র আইন বতীত এমন সব আইন যার মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয়। এমন সব বিচারক তাগুতের অন্তর্ভূক্ত যারা আল্লাহ্র আইনের বিরোধী আইন দ্বারা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে। শয়তান, যাদুকর, গণক (যারা এলমে গায়েবের বিষয় কথা বলে), উপাস্য হতে যারা রাজী, যারা নিজেদেরকে কোনো কিছু হালাল, হারাম করা ও আইন রচনা করার অধিকার রাখে বলে মনে করে, তারা সবাই তাগুত। তাদেরকে অস্বীকার করা ওয়াযিব, তাদের কাছ থেকে এবং তাদেরকে যারা উপাসনা করে উভয়ের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা অত্যাবশ্যক।

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী তাফহীমুল কুরআনে সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতের তাফসীরে তাগুত সম্পর্কে বলেনঃ আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে 'তাগুত' বলা হবে, যে নিজের বৈধ অধিকারের সীমানা লংঘন করেছে। কুরআনের পরিভাষায় তাগুত এমন এক বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু ও খোদা হবার দাবীদার

সাজে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। কোন ব্যক্তি এই তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কোন দিন সঠিক অর্থে আল্লাহ্‌র মু'মিন বান্দা হতে পারে না।

যারা আল্লাহ্‌র আইন মানে না তারা কাফের। আর যারা আল্লাহ্‌র আইন না মানার জন্যে অন্যদেরকে বাধ্য করে তাদেরকে বলা হয় তাগুত। যারা সাধারণ মানুষ তারা কাফের হতে পারে, তাগুত হতে পারে না। কিন্তু যারা রাজ ক্ষমতায় থাকে তারা কাফের এবং তাগুত দুই-ই হতে পারে। নিজে আইন অমান্য করা এটা তো নিঃসন্দেহে কুফরী কিন্তু যারা আইন করে আল্লাহ্‌র আইনকে অমান্য করায়, তারা প্রকৃতপক্ষে খোদার খোদায়ী নিয়ে টানা-টানি করে। কারণ যে ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র সেই ক্ষমতা তারা ব্যবহার করতে চায়। আমরা বহু তাগুতি আইনকে খুব হালকা নজরে দেখি। কিন্তু আল্লাহ্‌ তায়ালা হালকা নজরে দেখেন না। যেমন আমরা মনে করি চুরির শাস্তি স্বরূপ হাত কাটার পরিবর্তে জেল দিলে এমনকি গুরুত্ব অপরাধ হয়। চোরের শাস্তি দেয়াই হল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা দাঁড়ায় ভিন্নরূপ, যা মানুষ চিন্তা করে না। তা হচ্ছে এই যে, চোরের হাত কাটা আইন হচ্ছে আল্লাহ্‌র তৈরী ফৌজদারী আইন। সেটাকে বাতিল করে অন্য আইন তৈরী করার অর্থই হল আইন করে আল্লাহ্‌র আইনকে বাতিল করা। আর সুদ মদের লাইসেন্স দেয়ার অর্থ হল আল্লাহ্‌র আইনকে অমান্য করার লাইসেন্স দেয়া। এসব কাজ যারা করে তারাই হচ্ছে তাগুত। তারা যে শুধু নিজেরাই আল্লাহ্‌র আইন অমান্য করে তাই নয়, বরং তারা আইন করে অন্যদেরকেও আল্লাহ্‌র আইন অমান্য করতে বাধ্য করে। আল্লাহ্‌র কথা অনুযায়ী বুঝা গেল, যারা এই তাগুতের আইন মানে তারা আল্লাহ্‌কে মানতে পারে না। হাঁ তবে এমন কিছু মুসলমান আছে যারা আল্লাহ্‌কেও মানে তাগুতদেরকেও মানে। তারা মনে করে যে তারা ঠিকই করছে, কিন্তু আসলে যে তারা আল্লাহর সাথে শরিক করে মুশরিকে পরিণত হচ্ছে যার ফলে তাদের আল্লাহ্‌কে মানা হয় না সেই বোধ তাদের নেই। তাদের কথা সূরা নিসার মধ্যে আল্লাহ্‌ এইভাবে বলেছেন,

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে , যা আপনার প্রতি নাযিল হয়েছে, আমরা সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে [তার প্রতিও ঈমান এনেছি] তারা বিবাদ পূর্ণ বিষয়কে [মীমাংসার জন্য] তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে [তাগুতকে] মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" (আন নিসা ঃ ৬০)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যারা তাগুতকে অস্বীকার না করে (বরং তাদের আইন মেনে নিয়েই) আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার দাবী করে তাদের ওটা শুধু

দাবীই। প্রকৃতপক্ষে তাদের ঈমানের প্রতি আল্লাহ্‌র কোন স্বীকৃতি নেই। যদি থাকত তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাদের ঈমান সম্পর্কে **يزعمون** তারা মনে করে একথা বলতেন না। **[বিঃ দ্রঃ - রব, মালিক ও ইলাহ হিসেবে আল্লাহর পরিচয় খন্দকার আবুল খায়ের- খন্দকার প্রকাশনী]**

ঈমান আনার শর্তই হল-তাগুতকে অস্বীকার বা কুফরী করা

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। প্রকৃত শুদ্ধ ও নির্ভুল কথাকে ভুল চিন্তাধারা হতে ছাঁটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারণ করল, যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয় এবং আল্লাহ সবকিছু শ্রবণ করেন ও সবকিছু জানেন।" (আল-বাকারাহ ঃ ২৫৬)

শেখ মুহাম্মদ আলী আল রিফায়ী উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ এ আয়াতে, আল্লাহ্‌ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাদের কাছে এমন সীরাতুল মুস্তাকিম বা সহজ-সরল পথের বিবরণ দিচ্ছেন যা আমাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। এই সহজ-সরল পথ হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' গ্রহণ করার আগে তাগুতের প্রতি কুফরী বা অবিশ্বাস করা। অন্য কথায় আপনি 'আমি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি' (ইল্লা আল্লাহ্‌) বলার আগে আপনাকে তাগুত প্রত্যাখ্যান বা অবিশ্বাস করতে হবে (লা ইলাহা)।

যদি কোন ব্যক্তি বলেন, **'লা ইলাহা ইলাল্লাহ্‌'** এবং তিনি তখনও তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করেননি, তাহলে তিনি আল্লাহ্‌র (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) উপরোক্ত আয়াতের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন যাতে তিনি (আল্লাহ্‌) বলেছেন ঃ "এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনল সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারন করল, যাহা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয়।" এই আয়াতে আল্লাহ্‌ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) 'মাসাকা' শব্দের পরিবর্তে 'আসতামসাকা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবীতে মাসাকা অর্থ এক হাত দিয়ে বা এক হাতের মধ্যে কোনকিছু ধরা কিন্তু এই আয়াতে 'আসতামসাকা' প্রতীকীরূপে ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে উভয় হাত দিয়ে ধরা অথবা উভয় হাত দিয়ে কোনকিছুকে খুবই মজবুতভাবে ধরা। এটাকে আরো সহজ করতে যদি আমরা বলি যে, আপনি আপনার ডান হাতে কোনকিছু ধরে আছেন তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে আপনার বাম হাত খালি এবং আপনি আপনার বাম হাতে অন্য কিছু ধরতে পারেন। এইভাবে যদি আমরা বলি যে কেউ এক হাতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ধরে আছে এবং আরেক হাতে তাগুত ধরে আছে তাহলে তার বিশ্বাস (ঈমান) ঠিক নেই এবং তিনি ইসলামের গন্ডির বাইরে। এ কারণে আল্লাহ্‌ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) উপরোক্ত আয়াতে 'আসতামসাকা' শব্দ ব্যবহার করে আমাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট করেছেন যে, আমাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' আমাদের উভয় হাত দিয়ে ধরতে হবে এবং শুধুমাত্র এক হাতে নয়।

আমরা যারা অজ্ঞ মুসলিম তারা মনে করি নামায আর রোযাই শুধু এবাদত তাই আসল ঘটনা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে মানুষের লিখিত আমলের বই নিয়ে মসজিদে মসজিদে ঘরবাড়ি ছেড়ে গাট্টি বোঝা নিয়ে রাত কাটাই। মাওলানার ওয়াজ শুনে চোখের জলে দাড়ি ভিজাই। অথচ- শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা , অর্থ ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, শাস্তি ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সব তাগুতের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। এত আমল করছি যে তাগুত কাকে বলে জানিই না আর তাগুতকে অস্বীকার করা তো দূরের কথা। অথচ তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যতিত কেউ মুসলিম হতে পারে না। বিধান বা আইন দানের একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার। এরশাদ হচ্ছে ঃ

"আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান (দেয়ার ক্ষমতা) নেই।" (ইউসুফ ঃ ৪০)

"তিনি তার রাজ্যশাসনে কাউকে শরীক করেন না।" (কাহাফ ঃ ২৬)

"তোমাদের মাঝে যে ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় তা ফয়সালা করা আলাহর কাজ"! (আশ-শুরা ঃ ১০)

"অতএব তোমরা আল্লাহর নাযিল করা আইন মোতাবেক লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা কর, আর যে মহান সত্য তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে তা হতে বিরত থেকে তাদের খাহেশতের (ইচ্ছা-কামনার) অনুসরণ করো না।" (মায়েদা ঃ ৪৮)

"ইহারা কি আল্লাহর এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে যারা এদের জন্য 'দ্বীন' ধরনের কোন নিয়ম-বিধান নিদির্ষ্ট করে দিয়েছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ দেন নি? ফয়সালার সময় যদি পূর্ব হতেই নিদির্ষ্ট করে দেয়া না হোত, তা হলে এতদিন তাদের ব্যাপারটি চুড়ান্ত করে দেয়া হোত। নিশ্চিতই এই যালেমদের জন্য পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।" (আশ-শুরা ঃ ২১)

তাই আপনাদের অবগতির জন্য বলতে চাই যিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জের জন্য কোরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। তিনি আলাহই সুদ, জুয়া, মদ, হারাম করেছেন কুরআনের ওহীর মাধ্যমে। যা কিনা আমাদের জনগণের সার্বভৌম সংসদ হালাল করেছে- সুদী ব্যাংকের লাইসেন্স, লটারী হাউজীর অনুমতি এবং মদের দোকানের (বারের) লাইসেন্স দানের মাধ্যমে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোরানের অহীর এবং রাসূলের (সাঃ) মাধ্যমে পাঁচ প্রকার অপরাধের ফৌজদারী শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যথাঃ

(১) আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলামকে রক্ষা করার জন্য দ্বীন ত্যাগকারী এবং দ্বীন পরিবর্তনকারী মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

সহীহ হাদীস থেকে পাওয়া যায় মুরতাদকে এক থেকে তিন দিনের সময় দিতে হবে ইসলামের সহীহ আকিদায় ফেরত আসার জন্য। না হলে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে হবে। আমাদের জনগণের সার্বভৌম সংবিধান আল্লাহর এ আইনের কোন অস্তিত্ব নেই। তাই বেরেলভি (কবর পুজারী), কাদেয়ানী, শিয়া, সাইয়েদাবাদী, আটরশি, দেওয়ানবাগির মত আরো কয়েক হাজার মুরতাদ ও জিন্দীক আমাদের চারদিকে রোজই মাথা গজিয়ে উঠছে আর কোটি কোটি সরল প্রাণ আল্লাহর বান্দা মুসলিমদের শিরক কুফর ও বিদআতে লিপ্ত করে জাহান্নামের পথ ধরাচ্ছে। অথচ খোলাফায়ে রাশেদার সময় খলিফা আলী (রাঃ) বহু খারেজী এবং শিয়া মুরতাদকে হত্যা করে মুসলিমদেরকে ইসলামের সহীহ আকিদা হতে বের হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন।

(২) মানুষের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেসাসের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।

একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সাথে সমাজে চলার জন্য মুয়ামিলাত সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সম্পৃক্ত হতে হয়। শয়তানের প্ররোচনায় এবং নাফসের তারনায় একে অপরের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা, অঙ্গহানী, খুন যখমের সৃষ্টি হতে পারে। বান্দাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা কেসাসের বিধান নাযিল করেছেন। কিন্তু বর্তমানে আল্লাহর দেয়া কেসাসের বিধান উঠানোর পরিনাম কতটা ভয়াবহ হয়েছে তা কি একবার চিন্তা করেছেন। সমাজে চারিদিকে আজ ভয়াবহ করুন চিত্র। ধরুন কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক দ্বিতীয় ব্যক্তি অনিচ্ছায় কিংবা সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে খুন হয়ে গেল তবে ইসলামের কেসাস মোতাবেক প্রথম ব্যক্তির বিচারের ফায়সালা কাজী (জর্জ) সাহেবকে দিতে হবে দ্বিতীয় ব্যক্তির পরিবারের সাথে আলোচনা করে তাদের আল্লাহর দেয়া অধিকারের উপর। অপরাধ প্রমাণিত হলে তারা খুনের বদলী খুনের ফায়সালা নিতে পারে কিংবা মুক্তিপণ **(BLOOD MONEY)** আদায় করে খুনী প্রথম ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়ার ফায়সালাও চাইতে পারে। এতে উভয় পরিবারই কিছুটা হলেও নিস্কৃতি পায়। কিন্তু বর্তমান তাগুতদের তৈরি করা আইনের পরিণতি আমাদের সামনে উপস্থিত। যে মারল সে এবং তার পরিবার তো ভুক্ত ভোগী হয়ই উপরন্ত যাদের পরিবারের সদস্য মারা গেল তারা পর্যন্ত পুলিশের দৌড়ের উপর থাকে। উভয় পরিবারের উপর যেন ভয়ানক আযাব নেমে আসে। আল্লাহ তায়ালা আইন নাযিল করেছেন সাধারণ মানুষের ইনসাফ, প্রশান্তি, উপকারের জন্য। কিন্তু মানুষের তৈরিকৃত আইনে উপকার পাচ্ছে- পুলিশ, উকিল, মেজিষ্ট্রেট ও জর্জ। কারণ এক নম্বর দুনির্তীবাজ দেশের কিছুদিন আগে দেয়া রিপোর্টে দেখানো হয়েছে এদেশের সবচেয়ে বেশি দুর্নিতীবাজ পুলিশ ও নিু আদালত। (দৈনিক ইত্তেফাক রিপোর্ট)

(৩) মানুষের আল ইলম (জ্ঞানকে) রক্ষা করার জন্য মদ পানের অপরাধের জন্য হদ বা হুদুদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন।

মদ খেলে মানুষের সুস্থ বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়। মানুষ চিন্তা করা ছেড়ে দেয় এবং নফসের দাসত্ব করা শুরু করে। আল্লাহ তায়ালা মদ পানকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং মদ পানের জন্য নির্দিষ্ট হদ বা শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। আজ দুনিয়ার জনগণের সার্বভৌম সংসদগুলি মদের দোকান (বারের) লাইন্সেস, মদ আমদানী করা ও কেনা বেচা করার লাইন্সেস দানের মাধ্যমে মদ কেনাকে সহজ প্রাপ্য ও মদ খাওয়াকে হালাল করে দিয়েছে। তাই থার্টি ফাস্ট নাইটে এবং এ জাতীয় পাশ্চাত্যের ও হিন্দুদের থেকে আমদানী করা অনুষ্ঠানগুলিতে যেমন- গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানের নামে ব্যান্ডশো ও মদের আসরে কলেজ, ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের থেকে শুরু করে সকল স্তরের মদখোর লোকেরা অংশগ্রহণ করছে। প্রতি সপ্তাহে চলছে মদের পার্টি বড় ও ছোট হোটেল ও ক্লাবগুলিতে, অপরাধীদের ফ্লাট বা ম্যাসে, অভিজাত এলাকার বাড়ীগুলিতে ও মদের দোকানগুলিতে। সমাজের ধনী ও ক্ষমতাবানদের একটি দল ছুটছে এ মদের দিকে। এরাই সমাজের রক্ষক, সমাজ যাবে কোনদিকে? পরিণতি সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। যারা চোখ থাকতে অন্ধ তাদের কথা আলাদা।

(৪) মানুষের বংশ এবং পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ব্যভিচার এবং ব্যভিচারের দোষারোপের উপর শাস্তির (হুদুদের ও রজমের) ব্যবস্থা করেছেন।

আমেরিকা, ইউরোপ, রাশিয়া, ইসরাইলের কথাই একবার চিন্তা করুণ। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আলাহ্‌র কাছে জবাবদিহির ভয় ত্যাগ করে তারা কুফরী রাষ্ট্র কায়েম করেছে। উপর দিয়ে মাকাল ফলের মত যতই সৌন্দর্য মন্ডিত করে রাখুক না কেন ভিতরে তাদের অবস্থা যে কতটা জঘন্য পশুর ন্যায় তা একটু খোঁজ করলেই বেরিয়ে আসবে। মেয়েদের অধিকার বা হকের কথা চিন্তা করুন। আলাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মেয়েদেরকে একটি নিদিষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন। মাতৃত্বের সম্মান দিয়েছেন, বোনের অধিকার এবং স্ত্রীর মর্যাদা ও হক নির্ধারণ করেছেন। অথচ কুফরী রাষ্ট্র সমূহ মেয়েদের পুরুষের সাথে সম অধিকারের নামে তাদের পরিণতি কি করেছে তা কি একবার ভেবে দেখেছেন? আমেরিকা, ইউরোপ সহ সকল কুফর রাষ্ট্র সমূহে মদের দোকানে (বারে) প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় কারা মদের বোতল আর গ্লাস পরিবেশন করছে? বড় বড় জুয়ার আড্ডাগুলিতে একটা একটা করে কাপড় খুলে দর্শকদের দিকে কে উড়িয়ে দিচ্ছে? তাদের প্রতিটা ছোটবড় শহর গুলিতে যে সব ম্যাসেজ পার্লার আর বেশ্যালয় রয়েছে তাতে কারা এ সব কাজে নিয়োজিত। তাদের বানানো নগ্ন ছবিগুলিতে কাদেরকে তারা ব্যবহার করছে? এভাবে সম অধিকারের নামে মেয়েরা আজ পরিণত হয়েছে তাদের ভোগ্য পণ্যে। আমেরিকাতে প্রতিদিন গড়ে ২৫০টি মেয়ে ধর্ষন হয়- এটা তাদেরই পরিসংখ্যান। তাদের দেশের ২০% মহিলা কাজ করছে উলঙ্গ মদের দোকান, কেসিনো (জুয়ার আড্ডা) ম্যাসেজ পার্লার, বেশ্যালয় এবং নীল

ছবি গুলিতে । এটা কোন ধরনের মানবাধিকার? সচেতন মানুষ কি একবার চিন্তা করবে না? আফগান মুসলিম মহিলাদের জন্য তাদের যে মায়া কান্না তা নিজেদের মেয়েদের জন্য কোথায়?

আল্লাহর দেয়া ব্যাভিচারের শাস্তির হুকুমকে পিছে নিক্ষেপ করে পাশ্চাত্যের সমাজ অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতার নামে যে আইন বানিয়েছে তার পরিণতি আমাদের চোখের সামনে সুস্পষ্ট। বিয়ে না করে লিভিং টুগেদারের নামে বাপের পরিচয় ছাড়া যে লক্ষ লক্ষ শিশুর জন্ম নিচ্ছে তাদের বড় হয়ে মানসিক কি পরিণতি হয় তা কি একবার ভেবে দেখেছেন? আমেরিকাতে ৪০% এর উপরে মহিলারা তাদের সন্তানদের পিতার পরিচয় দিতে পারছে না, ইংল্যান্ডে ৭০ লক্ষ মহিলা রয়েছে যাদের সন্তানদের কোন পিতার পরিচয় নেই। আল্লাহর্‌ দেয়া বিধানকে পিছে নিক্ষেপ করে যে আইন তারা বানিয়েছে তার একটা ছোট চিত্র হল এগুলি। প্রতিটা বিষয়ে যেখানেই আল্লাহ্‌র আইনকে পরিবর্তন করা হয়েছে সেখানেই সাধারণ মানুষের উপর দুঃখ দুদর্শা নেমে এসেছে। সকল জনগণ পরিণত হয়েছে কিছু তাগুত শাসকের নব্য যুগের দাস-দাসীতে। মুসলমান নামধারী দেশগুলির কাফের তাগুত সরকারগুলি আমদানী করেছে পাশ্চাত্যের কুফর শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা, বিচার পদ্ধতি, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে। ফলে মুসলিম দেশগুলিতে মুসলমান জনগণ আস্তে আস্তে নিজের প্রকৃত পরিচয় ভুলে তাদের মন মগজে কাফেরদের নীতি ভরে নিয়েছে। তারা কথা বলে কাফেরের ভাষায়, চিন্তা করে কুফর দৃষ্টিকোণ থেকে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে বলেছেনঃ

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা এই আহলে কিতাবদের (ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের) মধ্যে একটি দলের কথা মানো তাহলে তারা তোমাদের ঈমান থেকে কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।" (আলে ইমরান ঃ ১০০)

মুসলিম দেশগুলিতে এখনও ব্যভিচারের মাত্রা খুবই কম। কারণ ১৪০০ বৎসর পূর্বে মদিনাতে ব্যভিচারের বিরুদ্ধে যে অহি নাযিল হয়েছিল এবং রাসূল (সাঃ) সহ খলিফারা সেই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে আল্লাহর নাযিলকৃত যে রজম ও হদের শাস্তি, তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তারই সুফল আজও আমরা মুসলিমরা সমাজে পাচ্ছি। আমাদের আলহামদুলিল্লাহ এখনও সমাজের বেশি ভাগ লোকেরই চিন্তা করতে হচ্ছে না- "আমার বাচ্চার বাবা কি আমি নিজে"- যা কিনা ইউরোপ আমেরিকান ও ভারতীয় কাফেরদের জন্য প্রতিদিনের চিন্তার বিষয়। তবে যেভাবে জনগণের সার্বভৌমত্ব শুরু হয়েছে এবং বেহায়াপনা, নগ্ন চিত্র প্রদর্শনী, টিভিতে অবৈধ মেলা মেশার উৎসাহ প্রদানকারী নাটক, সিনেমা, গান, অর্ধ নগ্ন বিজ্ঞাপন, সুন্দরী প্রতিযোগীতা, ফ্যাশন শো, থিয়েটারের নাটক, বিল বোডের মাধ্যমে রাস্তায় মোরে মোরে এবং বাসের গায়ে মহিলাদের অধ নগ্ন ছবি প্রদর্শনী ইত্যাদি বিষয় কিছু সময়ের মধ্যেই প্রাশ্চাত্যের সমাজের মত ব্যাভিচারের আখরা হতে বাধ্য। এ সমস্ত শুরু হওয়ার মূল কারণ ব্যভিচার সংক্রান্ত আল্লাহর আইনকে পিছে নিক্ষেপ করে মানুষের দ্বারা আইন রচনা করা।

(৫) মানুষের জান-মাল বা সম্পদ রক্ষা করার জন্য চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানির উপর হুদুদের ব্যবস্থা করেছেন।

বর্তমানে পশ্চিমা অপশক্তির প্রচারনায় আমাদের মনে ঢুকেছে যে, চুরি করলে কারো হাত কেটে ফেলা বর্বরতা। ইসলাম যে কোন অপরাধকে তার গোড়া থেকে উৎখাত করে দেয়। যেমন চোরের হাত কাটা-একজন চোরের ধরুন একটি মোবাইল চুরি করার সুযোগ আসল। তখন সে চিন্তা করে যদি চুরি করতে পারি তাহলে এ মোবাইলটা আমার আর যদি ধরা পড়ি তবে হয়ত বর্তমানে মানুষের তৈরী আইনের বিচারে তিন থেকে ছয় মাস জেল খানায় বসে বসে খাব। কিন্তু যদি আল্লাহর আইন থাকতো তবে অবশ্যই চোরটা চিন্তা করত দশবার যে, যদি মোবাইলটা চুরি করতে ধরা পড়ি তবে ডান হাতের কব্জি কাটা যাবে। জীবনে বেচে থাকলে হয়ত মোবাইল কিনার পয়সা কামানো যাবে কিন্তু ডান হাতের কব্জি আর ফেরত আসবে না। অতএব অবশ্যই অবশ্যই এটা ফেতরাত মানুষের চুরির প্রবণতা সমাজ থেকে একেবারে দূরুভীত হবে। সেই ১৪০০ বৎসর পূর্বে যখন মদিনাতে চোরের হাত কাটার হুকুম হয়েছিল তখন থেকে ৩০০ বৎসরে কয়জন লোকের হাত কাটা হয়েছিল চুরির অপরাধে আপনারা জানেন কি? মাত্র ৬ জনের। আশ্চর্য হলেও সত্য আজও আরব বিশ্বে চুরি নেই বললেই চলে। এটাই আল্লাহ তায়ালার আইন, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন কিভাবে সমাজে অপরাধ গোড়া থেকে দূরুভীত করতে হবে।

[বিঃ দ্রঃ - জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দন্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। 'ভারতীয় দন্ডবিধি' 'বাংলাদেশ দন্ডবিধি' ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব ধরনের শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এরূপ নয়। ইসলামী শরীয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ হুদুদ কেছাছ ও তা'যীরাত অর্থাৎ দন্ডবিধি। যেসব অপরাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্টজীবের প্রতিও অন্যায় করা হয় এবং স্রষ্টারও নাফরমানী করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে 'হক্কুল্লাহ' (আল্লাহর হক) এবং 'হক্কুল আবদ' (বান্দার হক) উভয়টিই বিদ্যমান থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়। একথা জানা জরুরী যে, ইসলামী শরীয়ত বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি; বরং খলিফার নিয়োগকৃত বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্যে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন। যেসব অপরাধের কোন শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করেনি, বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তাযিরাত' তথা দন্ড বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে সেগুলো দু'রকম - কুরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহর হক হিসেবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে 'হুদুদ' বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে,, সেগুলোকে 'কেছাছ' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, সে জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় 'তাযীর' 'দন্ড'। দন্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এ ব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদুদের বেলায় কোন সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক তা ক্ষমাও করতে পারেনা। শরীয়তে হুদুদ মাত্র পাচঁটি ঃ ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ এ চারটির শাস্তি কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি সাহাবায়ে কেরামের এজমা তথা ঐক্যমত্য দ্বারা

প্রমাণিত। এভাবে মোট পাচঁটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোন শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারেনা, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গোনাহ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হুদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদুদ তওবা দ্বারা মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক অথবা পরে। সব দন্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়; কিন্তু হুদুদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুই-ই নাজায়েয। রাসূলুল্লাহ (স) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হুদুদের শাস্তি সাধারণত ঃ কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্মম। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্যে থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হুদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, অপরাধ সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা যায় না।এ ব্যাপারে শরীয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে **الحدود تدرى با لشتها ت** অর্থাৎ, হুদুদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে বুঝে নেয়া উচিত যে, কোন সন্দেহ অথবা কোন শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরও বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে দন্ডগত শাস্তি দেবেন। শরীয়তের দন্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণত ঃ দৈহিক ও আর্থিক। এগুলো দৃষ্টান্ত মূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। ধরুন, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিনজন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য এ মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, রবং বিচারক তাকে অন্য কোন উপযুক্ত দন্ড প্রদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হতে পারে। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন অবম্বনে)]

এ পাঁচটি অপরাধের উপর শাস্তির পরিমাণ ও হুকুম কুরআন সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত। দুনিয়ার সকল সংসদ আজ আল্লাহর এই আইনকে পিছে নিক্ষেপ করেছে। অথচ আল্লাহর দেয়া হদ(দন্ড) কার্যকর প্রসঙ্গে নবীজী (সাঃ) বলেছেনঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালার কোনো একটি 'হদ' (দন্ড) কার্যকর করা আল্লাহর নগরসমূহে চল্লিশ রাত বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার চাইতে উত্তম। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

জনগণের সার্বভৌম সংসদ আল্লাহর দেয়া ফৌজদারি সকল আইন পরিবর্তন করেছে মানুষের তৈরী করা আইন দিয়ে। তারা জনৈক ডক্টর তথাকথিত নাস্তিক বুদ্ধিজীবিকে দিয়ে বৃটিশ, জার্মান আইনের সাথে ইসলামিক, হিন্দু এবং খৃষ্টানদের পারিবারিক আইন মিলিয়ে খিচুরী করে একটি কুফরী সংবিধান লিখিয়েছে। অথচ কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা

মুসলিমদের সংবিধান পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যেই সংবিধান দিয়ে মুসলিম খলিফারা এক হাজারেরও বেশী সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ উম্মাহকে শান্তিতে পরিচালিত করেছেন। অতএব এই কুফরী আইন যারা রচনা করেছে এবং এই কুফর আইন দ্বারা যারা দেশ পরিচালনা পূর্বে করেছে এবং বর্তমানে করছে তারা সকলেই তাগুত। আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ তাদের প্রত্যাখ্যান করা।

কাফের কুফরী করে আল্লাহ তায়ালার সাথে উনাকে ইলাহ মেনে নেয়ার ব্যাপারে এবং উনার হুকুম আহকাম অনুসারে চলার ব্যাপারে। তাই আল্লাহ তায়ালা আমাদের মুসলিমদের হুকুম দিয়েছেন **তাগুতের সাথে কুফরী বা কুফর-বিত তাগুত** করার জন্য অর্থাৎ তাগুতের হুকুম অনুসরন করতে নিষেধ করেছেন এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করে তার থেকে নিরাপদ দূরুত্ব বজায় রাখার হুকুম করেছেন। প্রতিটি যুগেই নবী পাঠানোর উদ্দেশ্যে ছিল একটাই আর তা হচ্ছে

"আমি প্রত্যেক উম্মতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, আর তাহার সাহায্যে সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছি, যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন, আর কিছু সংখ্যক লোকের জন্য গোমরাহী অবধারিত হয়ে গেলো। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমন করো, আর লক্ষ্য করো মিথ্যারূপকারীদের কি রকম পরিণতি হয়েছে।" (সুরা নাহল-৩৬)

যারা তাগুতের বাহিনীতে কর্মে নিয়োজিত তাদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন-

"যারা ঈমানদার তারা তো যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেই পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে; শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।"(সূরা নিসা ঃ ৭৬)

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ শেষ যামানায় যালেম শাসক, ফাসেক মন্ত্রী, অনিষ্টকারী বিচারক এবং মিথ্যাবাদী ফকীহদের আবির্ভাব ঘটাবে। তোমাদের মধ্যে যারা সে যুগে বেঁচে থাকবে তারা যেনো এদের কর আদায়কারী না হয়। তাদের কোনো সরদারী জমিদারী গ্রহণ না করে এবং পুলিশ ও নিরাপত্তা বিভাগে কোনো পদ গ্রহণে রাজী না হয়।

(তাবরানী) { এন্তেখাবে হাদীস পৃষ্ঠা-৭২ আধুনিক প্রকাশনী]

যারা তাগুতের আইন (মানুষের দ্বারা লিখিত আইন) দ্বারা বিচার ফয়সালা করে আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে বলেছেন-

"যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।" [মায়েদা ঃ ৪৪]

"তারা বিবাদ পূর্ণ বিষয়কে [মীমাংসার জন্য] তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে [তাগুতকে] মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" (আন নিসা ঃ ৬০)

যারা তাগুতকে অস্বীকার করে নির্যাতিত নিষ্পেষিত অবস্থায় রয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে চিরস্থায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন

যারা তাগুতের বন্দেগী থেকে (ইবাদতের ক্ষেত্রে বা হুকুমের অনুসরনের ক্ষেত্রে) পাশ কাটাইয়া রইল (দূরে থাকে) এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে (অনুতপ্ত হয়ে), তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব , সুসংবাদ দিন আমার সেই বান্দাদেরকে- (যুমার ঃ ১৭)

তাগুতের বন্দেগী বা তাগুতের হুকুমের অনুসরনকারীদের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

"বল ঃ আমি কি নির্দিষ্ট করিয়া সেই সব লোকের নাম বলিব, যাহাদের পরিণতি আল্লাহর নিকট ফাসেক লোকদের পরিণতি হইতেও নিকৃষ্টতম হইবে? তাহারা সেই লোক যাহাদের উপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন, যাহাদের উপর তাঁহার অসন্তোষ নাযিল হইয়াছে, যাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোককে বানর ও শুকর বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহারা 'তাগুতের বন্দেগী করিয়াছে; তাহাদের অবস্থা অধিকতর খারাপ এবং তাহারা 'সওয়াউস-সাবীল' হইতে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হইয়া বহুদুরে গিয়া পড়িয়াছে।" (আল-মায়েদা ৬০)

"যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ও সহায়। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে তাগুত। সে তাদেরকে আলোক থেকে অন্ধকারের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী। সেখানে থাকবে এরা চিরকালের জন্য।" (সূরা আল বাকারাহ ঃ ২৫৭)

মুনাফেক

মুনাফেক শব্দটি আরবী নেফক(نفق) ধাতু হতে নির্গত। যেমন–(نفق) শব্দটির অর্থ হচ্ছে এমন একটি সুড়ঙ্গপথ যার একদিক হতে প্রবেশ করার এবং অপরদিক হতে বের হবার রাস্তা রয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় অর্থ হচ্ছেঃ "দ্বীন ইসলামের এক দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করে অপর দরওয়াজা দিয়ে বের হয়ে আসা।"(মুফরাদাতে ইমাম রাগেব)

দ্বীন ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করার পর তা থেকে আবার ফিরে আসা দু'টি কারণে হতে পারে। **(১)** এ প্রবেশ হয়েছে শুধু লোক দেখানোর জন্য। আন্তরিকভাবে

সে ইসলামকে গ্রহণ করেনি, বরং মন আত্মা তার কুফরের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। **(২)** দ্বিতীয়তঃ এ প্রবেশ ইসলামের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস-অনুরাগ ও মহব্বত নিয়েই হয়েছে। লোক দেখানোর জন্য সে ইসলামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেনি। কিন্তু এ সম্পর্কটি এত দুর্বল যে অন্যান্য সম্পর্ক পূর্ণরূপে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। প্রথম শ্রেণীর নেফাককে"নেফাকী আকীদা" (বা বিশ্বাসগত মুনাফেক)। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নেফাককে "নেফাকী আমলী" (বা চরিত্রগত মুনাফেক) বলা হয়। যেমন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলবী(রঃ)তাঁর স্বলিখিত **"ফওযুল কবীর"** কিতাবে লিখেছেনঃ –"নবুয়াতী যুগে দু'ধরনের মুনাফেক বর্তমান ছিল,

(১) এক ধরনের মুনাফেক ছিল যারা মুখে কলেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতো বটে, কিন্তু তাদের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে কুফর, নাস্তিকতা ও বেঈমানীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা হচ্ছে সেই মুনাফেক যাদের পরিণতি সম্পর্কে আল-কুরআন কঠোর ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ

"অর্থাৎ নিঃসন্দেহে এ সব মুনাফেক জাহান্নামের সর্বনিম্ন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবে।" **(আন-নিসা ঃ ১৪৫)।**

(২)আর দ্বিতীয় ধরনের হলো ঐ সকল লোক যারা আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের ঈমানে দৃঢ়তা ছিল না। নানারূপ দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। যেমন এক শ্রেণীর লোক ছিল যারা সর্ব বিষয়ে জাতীয় চরিত্র ও কর্মধারাকে অনুসরণ করে চলতো। যদি তাদের সম্প্রদায় মুসলমান হয়ে যেত, তবে তারাও মুসলমান হত। আর তারা কাফের থাকলে এরাও কাফেরই থাকত। আর এক শ্রেণীর লোক ছিল যাদের অন্তঃকরণ পার্থিব স্বার্থসুলভ লালসায় পরিপূর্ণ ছিল, আল্লাহ ও রাসূলের মহব্বতের জন্য কোন স্থানই তাদের অন্তরে খালি ছিল না। অথবা ধন-সম্পদের লোভ-লালসা ও হিংসা বিদ্বেষের বাতেনী রোগ তাদের মন-মগজ ও অন্তঃকরণকে এমনভাবে বিষাক্ত করেছিল যে, প্রার্থনার স্বাদ ও ইবাদতের বরকত অনুভব করার কোন সুযোগই অবশিষ্ট ছিল না। আবার কিছু লোক ছিল যাদেরকে অর্থনৈতিক চিন্তা ও কর্মব্যস্ততা এমনভাবে বস্তুবাদী ও দুনিয়ামুখী করে রেখেছিল যে, পরকালের চিন্তা-ভাবনা ও আশা-আকাংখা পোষণের কোন সুযোগই তারা পেত না। আবার এমন একদল লোকও ছিল যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুয়াতের প্রতি পূর্ণরূপে আস্থাবান ছিল না এবং তাদের অন্তরে অর্থহীন কুধারণা ও সন্দেহবাদীতা স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু এ কুধারণা ও সন্দেহবাদীতা এমন পর্যায়ে ছিল না যাতে করে তারা ইসলামের গন্ডীসীমা হতে বের হয়ে পড়ে। এ ধরনের আরো কিছু বৈষয়িক কারণ ছিল যার ফলে তাদের নবুয়াতে মুহাম্মদীর উপর অনিশ্চিত ও অসন্তুষ্ট করে রেখেছিল। এমনও লোক ছিল যারা স্বীয় গোত্রীয় ও বংশীয় স্বার্থে এবং তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতো। এমন কি হক ও বাতিলের সংগ্রামে ইসলামের স্বার্থকে পদাঘাত করতেও তারা কুণ্ঠিত হতো না। এ দ্বিতীয় শ্রেণীর নেফাককেই নেফাকে আমলী বা চরিত্রগত মুনাফেকী বলা হয়।"

মুনাফিক বনাম গুনাহগারঃ

মুনাফেকীর যে সকল নিদর্শন ও আলামত ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি তার কোন একটি নির্দেশ ও আলামত কোন লোকের মধ্যে পরিদৃষ্ট হলে তাকে বিনা চিন্তায় মুনাফেক ধারণা করা উচিত নয়। মুনাফেকের যতগুলো বৈশিষ্ট্য উপরে বর্ণিত হয়েছে তার অধিকাংশের উৎসমূল হচ্ছে মানুষের আত্মিক দুর্বলতা ও সীমাহীন পার্থিব লোভ-লালসা। আর এ আত্মিক দুর্বলতা ও সীমাহীন পার্থিব লোভ-লালসা সমস্ত পাপেরও উৎসমূল। এ কারণেই একজন খাঁটি মুসলমানের থেকে এ সব কার্যাবলী প্রকাশ পাওয়া অসম্ভবের কিছুই নয়। কেননা, নবী-রাসূলগণ ব্যতীত মানুষ যতই দৃঢ় ও মজবুত ঈমানদার হোক না কেন তারা কখনই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই গুনাহর প্রবৃত্তি (নাফস) বর্তমান। এ জন্যই একজন মুসলমান যেখানে খুব ভাল কাজ করছে সেখানে তার থেকে পাপের কাজও হতে পারে–হচ্ছে। একজন মুনাফেকের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কোন সময় একজন মুসলমানের দ্বারা সে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়া কোনক্রমেই অসম্ভব নয়। সুতরাং এখানে মুনাফেক ও গুনাহগার মুসলমানের মর্যাদা এবং তাদের উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য ভালরূপে বুঝে নেয়া উচিত।

কোন মুনাফেক যখন ইসলামের তালিম তরবিয়াত ও জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী কোন কাজ সাফল্যের সাথে করে, তখন তার অন্তর এ খারাপ কাজের জন্য কোন প্রকার অনুতাপ করার পরিবর্তে বরং তার সাফল্যজনক কূটনৈতিকতার জন্য গর্ববোধ করে। কিন্তু একজন মুসলমানের দ্বারা কি এমন কাজ কখনো হতে পারে? যদি অলক্ষ্যে হয়ে যায়, তখন তার অন্তর ও মন–প্রাণের অবস্থা কি হতে পারে–কুরআনে হাকীম তার বর্ণনায় বলেছেঃ

"আর জান্নাত হচ্ছে সেই সকল মোত্তাকী লোকদের জন্য, যারা ভুলবশতঃ যদিও কোন অশ্লীল কাজ করে বা পাপের কাজ করে স্বীয় আত্মার উপর যুলুম করে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মনে আল্লাহ তায়ালার খেয়াল ও স্মরণ এসে যায়। আর তারা নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর এমন কে আছে যে, গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? কেহই নেই। আর এ সকল মোত্তাকী লোকেরা বুঝে শুনে জ্ঞাতস্বারে ঐ সকল কৃত গুনাহর কাজ আর দ্বিতীয়বার করে না।" **(আলে-ইমরাণ ঃ ১৩৫)**

আর একস্থানে বর্ণিত হয়েছেঃ

"আর নফসের প্রবল আবেগ-উচ্ছাসের মুখে পড়ে অজ্ঞতাবশতঃ যাদের থেকে গুনাহর কাজ হয়ে পড়ে, আর গুনাহ করার পর নিজেরা তাওবা করে এবং সংশোধিত হয়, এমন লোকদের বেলায় নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।" **(নাহল ঃ ১১৯)**

উল্লেখিত আয়াত গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কয়েকটি বিষয় আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়। **প্রথমত ঃ** একজন মুসলমানের থেকে পাপের কাজ হওয়া সম্ভব এবং হয়েও থাকে। **দ্বিতীয়তঃ** মুসলমানদের থেকে গুনাহর কাজ প্রকাশ হয়ে

পড়লে তা বুঝে-শুনে হয় না বরং অজ্ঞতা ও নফসের আকস্মিক আবেগ-উচ্ছাসের দ্বারা পরাজিত ও প্রভাবিত হবার দরুনই হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত ঃ মুসলমান পাপের কাজ করার পর তাদের অন্তঃকরণ আল্লাহর ভয়ে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে উঠে। আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর সুবিচারী গুণ বৈশিষ্ট্যটি তার চক্ষের সামনে মূর্তিমান হয়ে দন্ডায়মান হয়। তার ঈমানের কারণে ললাটভূমি ভীত, কম্পিত ও শংকায় ঘর্মাক্ত পানি দ্বারা সিক্ত হয়ে উঠে। কাল বিলম্ব না করে তারা স্বীয় অপরাধের জন্য রব্বুল আলামীনের দরবারে সিজদায় পড়ে অঝোরে রোদন করতে থাকে। আর প্রার্থনা করতে থাকে তাঁর নিকট ক্ষমা ও মাগফেরাতের জন্য। সংশোধন হয়ে যায় ভবিষ্যতের আগত দিনগুলোর জন্য। আর **চতুর্থ** যে বিষয়টি আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়, তা হচ্ছে তৃতীয় বিষয়টির আর একটি দিক। অর্থাৎ তারা নিজেদের কোন পাপের কাজের উপর স্থির হয়ে থাকে না। বরং তা পরিহার করে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায় এবং এ জন্য তাদের মন মগজ, লজ্জা ও অবমাননার ব্যাথায় ব্যাথিত হয়ে উঠে। কিন্তু মুনাফেকদের মধ্যে এহেন গুণাবলী আদৌ বর্তমান থাকে না। তারা শরীয়তের বিপরীত কাজগুলো নফসের কোন আকস্মিক আবেগ উচ্ছাসের বশবর্তী হয়ে করে না। বরং জেনে বুঝে ও সজাগ অনুভূতি নিয়েই দ্বিধাহীন চিত্তে করে। শরীয়তের বিরুদ্ধাচারণ করাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নেয়। তাদের কলবে তখন আর তাওবা ও এস্তেগফার দূরের কথা, আল্লাহর ভয় ভীতির নাম-গন্ধও বিদ্যমান থাকে না।

একজন মুনাফেক ও একজন গুনাহগার মুসলমানের মধ্যে এ হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য। মুনাফেকী হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে একটি বিপরীতধর্মী বিষ। তার মধ্যে আদৌ ঈমানের কোন চিহ্ন নেই। পক্ষান্তরে গুনাহ করার পর যদি মানুষ লজ্জিত না হয় এবং নিজের সংশোধনের জন্য ব্যাকুল হয়ে না উঠে, তবে এ গুনাহই শেষ পর্যন্ত মুনাফেকীর বীজ বপন করে। গুনাহর ব্যাপারে তার কর্ম চরিত্র যদি এমনিই থেকে যায়, তবে তার দ্বারাই মুনাফেকীর বীজ অংকুরিত হয়ে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে কালক্রমে বিরাট বিশাল বৃক্ষের রূপ ধারণ করে। **আল্লাহ বলেন ঃ**

"তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি তাদেরকে তাঁর ফজল-করম দ্বারা অনুগ্রহ করেন, তবে অবশ্যই তারা তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে, সদকা দিবে এবং পুণ্যবান মুসলমান হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যখন তাদেরকে তার ফজল ও করম দ্বারা অনুগ্রহ করলেন তখন তারা কৃপণতা প্রদর্শন করল। ফলে তারা আল্লাহর সহিত সাক্ষাত পর্যন্ত তাদের অন্তরে মুনাফিকী সৃষ্টি করে নিল। কেননা, তারা আল্লাহর সাথে যে চুক্তি করে ছিল সে চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলেছে তারা হল মিথ্যাচারী।" (তাওবা ঃ ৭৫-৭৭)

উল্লেখিত কুরআনে হাকীমের বাণী দ্বারা বোঝা যায় যে, গুনাহ এক জিনিস এবং মুনাফিকী আর এক জিনিস। কিন্তু এদের উভয়ের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক

বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ গুনাহ কোন কোন সময় মুনাফিকীর ন্যায় দুরারোগ্য রোগও মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে। কলেরা- মহামারীর সময়কার সাধারণ একটি পেটের পীড়া-যেমন কোন কোন সময় কলেরায় রূপান্তরিত হয়। এমনিভাবে গুনাহও কোন কোন সময় মানুষের মধ্যে মুনাফেকী সৃষ্টি করে। এ জন্যই আকস্মিক গুনাহর কাজ হয়ে পড়লে সে জন্য নির্ভয় ও নিশ্চিত থাকা উচিত নয়। বরং তার বিভিষিকাময় পরিণতি হতে নিরাপদ থাকার জন্য চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। নতুবা তা মুনাফিকীর দূরারোগ্য রোগ আমাদের অলক্ষ্যে সৃষ্টি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

"তোমাদের আমল যেন এমনভাবে নিস্ফল ও ধ্বংস না হয় যা তোমরা বুঝতেও পারো না।" **(হুজুরাত ঃ ২)**

সুন্নাত

'সুন্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ **الطريق** 'পথ'। কুরআন মজিদে এই 'সুন্নাত' শব্দটি বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি আয়াত হলঃ

"আল্লাহর সুন্নাত, যা পূর্ব থেকেই কার্যকর হয়ে রয়েছে। আর আল্লাহর এ সুন্নাতে কোনরূপ পরিবর্তন দেখবে না কখনো।" (ফাতাহ্ ঃ ২৩)

এ আয়াতে ব্যবহৃত সুন্নাত শব্দের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ **طريقه** পথ, পন্থা এবং পদ্ধতি। এভাবে দেখা যায় যে, 'সুন্নাত'শব্দটি যেমন আল্লাহর ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়েছে, তেমনি করা হয়েছে নবী ও রাসূলদের ক্ষেত্রেও।

আল্লাহর সুন্নাত ও নবীর সুন্নাত ঃ ইমাম রাগেব ইসফাহানী বলেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার সুন্নাত বলা হয় তাঁর কর্মকুশলতার বাস্তব পন্থাকে, তাঁর আনুগত্যকারীর নিয়ম পদ্ধতিকে। আর নবীর সুন্নাত হচ্ছে সেই নিয়ম, পন্থা ও পদ্ধতি, যা তিনি বাস্তব কাজে ও কর্মে অনুসরণ করে চলতেন।

হাদীস-বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় 'সুন্নাত' হচ্ছে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর মুখের কথা, কাজ ও সমর্থন। অনুমোদনের বর্ণনা যাকে প্রচলিত কথায় বলা হয় 'হাদীস'। আর ফিকাহ্শাস্ত্রে 'সুন্নাত' বলা হয় এমন কাজকে, যা ফরজ বা ওয়াজিব নয় বটে; কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তা প্রায়ই করেছেন। এখানে এ দুটো সুন্নাতের কোনটি-ই আলোচ্য নয়।

আমাদের আলোচ্য সুন্নাত হল সেই মূল আদর্শ, যা আল্লাহ্ তা'য়ালা বিশ্ব-মানবের জন্যে নাযিল করেছেন, যা রাসূলে করীম (সাঃ) নিজে তাঁর জীবনে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের বিশাল ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন; কেননা নবী করীম (সাঃ) যা বাস্তবভাবে অনুসরণ করেছেন, তার উৎস হল ওহী, যা আল্লাহ্র নিকট থেকে তিনি লাভ করেছেন। এ 'ওহী' দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে আল্লাহ্র কালাম

কুরআন মজীদ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ওহীয়ে খফী, বিশেষ পন্থায় আলাহ্‌র জানিয়ে দেয়া বিধান ও নির্দেশ। রাসূলে করীম (সাঃ) এর কর্মজীবনে এ দুটোরই সমন্বয় ঘটেছে পুরোপুরিভাবে। আর তাই হচ্ছে 'সুন্নাত' তাই হচ্ছে পরিপূর্ণ দ্বীন-ইসলাম। কুরআন মজীদে রাসূলের জবানীতে বলা হয়েছেঃ "আমি কোন আদর্শই অনুসরণ করি না' করি শুধু তাই যা আমার নিকট ওহীর সূত্রে নাযিল হয়।" ওহীর সূত্রে নাযিল হওয়া আদর্শই রাসূলে করীম (সাঃ) বাস্তব কাজে ও কর্মে অনুসরণ করেছেন, তা-ই হচ্ছে আমাদের আলোচ্য 'সুন্নাত'। এই সুন্নাতেরই অপর নাম ইসলাম। কুরআন মজীদে এই সুন্নাতকেই 'সিরাতুল মুস্ত াকিম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলের জবানীতে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

"নিশ্চয়ই এ হচ্ছে আমার সঠিক সরল দৃঢ় পথ (সিরাতুল মুস্তাকীম)। অতএব তোমরা এ পথই অনুসরণ করে চলবে, এ ছাড়া অন্যান্য পথের অনুসরণ তোমরা করবে না। তা করলে তা তোমাদের এ পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে নিয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ তোমাদের এরূপ-ই নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা ভয় করে চল।"

(আনআম ঃ১৫৩)

ইমাম শাতেবী 'সিরাতুল মুস্তাকীম'-এর পরিচয় দান প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ 'সিরাতুল মুস্তাকীম' হচ্ছে আল্লাহ্‌র সেই পথ, যা অনুসরণের জন্যে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন। আর তা-ই সুন্নাত; আর অন্যান্য পথ বলতে বোঝানো হয়েছে বিরোধ ও বিভেদপন্থীদের পথ, যা মানুষকে 'সিরাতুল মুস্তাকীম' থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আর তারাই হচ্ছে বিদয়াতপন্থী লোক।

বিদ্‌য়াত

সুন্নাত হচ্ছে তা-ই, যা বিদ্‌য়াতের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা এ সুন্নাতের বিপরীতই হচ্ছে বিদ্‌য়াত। ইমাম রাগেব 'বিদ্‌য়াত' শব্দের অর্থ লিখেছেনঃ কোনরূপ পূর্ব নমুনা না দেখে এবং অন্য কিছুর অনুসরণ না করেই কোন কার্য নতুনভাবে সৃষ্টি করা। অর্থাৎ শরীয়াত প্রবর্তক যে কথা বলেন নি সে কথা বলা এবং তিনি যা করেন নি এমন কাজকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা-তা-ই হচ্ছে বিদয়াত। এমন সব কাজ করা বিদয়াত, যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।

কুরআন মজিদে এ বিদআত শব্দটি আল্লাহ্‌ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে দুটো আয়াতে।

"আসমান-যমীনের সম্পূর্ণ নবোদ্ভাবনকারী, নতুন সৃষ্টিকারী।" (আল-বাকারা)
"তিনি তো আসমান-যমীনের নব সৃষ্টিকারী।" (আনআম ঃ ১০১)

এ দুটো আয়াতেই আল্লাহ্‌ তা'য়ালাকে 'আসমান যমীনের বদীউন'-পূর্ব দৃষ্টান্ত পূর্ব উপাদান ও পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই সৃষ্টিকারী বলা হয়েছে।

সূরা 'আল-কাহাফ'-এর এক আয়াতে 'বিদয়াত' শব্দের এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায়। ইরশাদ হচ্ছেঃ

"বল হে নবী, আমি আমলের দিক দিয়ে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের কথা কি তোমাদের বলব? তারা হচ্ছে এমন লোক, যাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনাই দুনিয়ার জীবনে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে আর তারাই মনে মনে ধারনা করে যে, তারা খুবই ভাল কাজ করেছে।" (আল কাহাফ ঃ ১০৩-১০৪)

বিদয়াতপন্থীরাও ঠিক এমনি। তারা যেসব কাজ করে, আসলে তা আল্লাহ্‌র দেয়া নীতির ভিত্তিতে নয়। তা সত্ত্বেও তারা তাকেই নেক আমল এবং বড় সওয়াবের কাজ বলে মনে করে।

হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্নিত দীর্ঘ হাদীসে রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন "তোমাদের অবশ্যই অনুসরণ করে চলতে হবে আমার সুন্নাত এবং হিদায়াত প্রাপ্ত সত্যপন্থী খলীফাদের সুন্নাত! তোমরা তা শক্ত করে ধরবে, দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরে স্থির হয়ে থাকবে (যেন কোন অবস্থায়ই তা হাতছাড়া হয়ে না যায়, তোমরা তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত হয়ে না পড়)"। (মুসনাদে আহমদ)

কুরআন মজীদে দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেনঃ

"আজকের দিনে তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ -পরিণত করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম-মনোনীত করলাম।"

(আল-মায়েদা ৩)

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ। তাতে নেই কোন অসম্পূর্ণতা, কোন কিছুর অভাব। এ দ্বীনে বিশ্বাসী ও এর অনুসরণকারীদের কোন প্রয়োজন হবে না এ দ্বীন ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার, বাইরের কোন কিছু এতে শামিল করার এবং ভিতর থেকে কোন কিছু বাদ দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়ার কেননা এতে মানুষের সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অতএব না তাতে কোন জিনিস বৃদ্ধি করা যেতে পারে, না পারা যায় তা থেকে কোন কিছু বাদ দিতে। এ দুটোই দ্বীনের পরিপূর্ণতার বিপরীত এবং আলাহ্‌র উপরোক্ত ঘোষণার স্পষ্ট বিরোধী। ইসলামী ইবাদতের ক্ষেত্রে সওয়াবের কাজ বলে এমন সব অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করা, যা নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের জামানায় চালু হয়নি এবং তা দেখতে যতই চাকচিক্যময় হোক না কেন তা স্পষ্টই বিদয়াত, তা দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতার কুরআনী ঘোষণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণেই ইমাম মালিক বলেছিলেনঃ "সেকালে যে কাজ দ্বীনি কাজ বলে ঘোষিত ও নির্দিষ্ট হয়নি, আজও তাকে দ্বীনি কাজ বলে মনে করা যেতে পারে না।"

অতীতকালের নবীর উম্মতদের দ্বারা নবীর উপস্থাপিত দ্বীন বিকৃত ও বিলীন হয়ে যাওয়ারও একমাত্র কারণই ছিল যে, তারা নবীর প্রবর্তিত ইবাদতে

মনগড়াভাবে নতুন জিনিস শামিল করে নিয়েছিল। কিছুকাল পরে আসল দ্বীন কি, তা চিনবার আর কোন উপায়ই থাকল না।

'দ্বীন' তো আল্লাহ্‌র দেয়া এবং রাসূলের উপস্থাপিত জিনিস। তাতে যখন কেউ নতুন কিছু শামিল করে, তখন তার অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ্ বা রাসুলে করীম (সাঃ) যেন বুঝতেই পারছিলেন না দ্বীন কিরূপ হওয়া উচিত আর এরা এখন বুঝতে পারছে, তাই নিজেদের বুঝমত সব নতুন জিনিস এর মাঝে শামিল করে এর ত্রুটি দূর করতে চাইছে এবং অসম্পূর্ণতাকে সম্পূর্ণ করে তুলছে। আর এর ভিতর থেকে কিছু বাদ-সাদ দিয়ে একে যুগোপযোগী করে তুলতে চাইছে। এরূপ কিছু করার অধিকার তাকে কে দিল? আল্লাহ্ দিয়েছেন? তাঁর রাসূল দিয়েছেন? ---না, কেউ ই দেয় নি, নিজ ইচ্ছে মতই সে করেছে। ঠিক এ দিকে লক্ষ্য করেই হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)বলেছেন। "যে ইবাদত সাহাবায়ে কেরাম করেন নি, সে ইবাদত তোমরা কর না। তাকে ইবাদত বলে মনে কর না, তাতে সওয়াব হয় বলেও বিশ্বাস কর না।"

এ বিদয়াত এমনই এক মারাত্মক জিনিস, যা শরীয়তের অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দেয়া ও রাসূলের প্রদর্শিত ফরজ ওয়াজিবকে পর্যন্ত বিকৃত করে দেয়। শরীয়াতের ফরজ ওয়াজিবের প্রতি অন্তরে থাকে না কোন মান্যতা গণ্যতার ভাবধারা। শরীয়াতের সীমালংঘন করার অভ্যাস হতে থাকে। শরীয়াত বিরোধী কাজগুলোকে তখন মনে হতে থাকে খুবই উত্তম। যে লোক ইসলামে কোন বিদ্‌য়াত উদ্ভাবন করবে এবং তাকে ভাল ও উত্তম মনে করবে, সে যেন ধারণা করে নিয়েছে যে, নবী (সাঃ) রিসালাত ও নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করেন নি, খেয়ানত করেছেন। কেননা তিনি যদি দায়িত্ব পালন করেই থাকেন, তাহলে ইসলাম ও সুন্নাত ছাড়া আর তো কোন কিছুর প্রয়োজন পরে না। সব ভালই তো তাতে রয়েছে।

সত্যিকারভাবে যে দ্বীন রাসূলের নিকট থেকে পাওয়া গেছে, ঠিক তা-ই পালন করে চলা উচিত সব মুসলমানের। না তাতে কিছু কম করা উচিত, না তাতে কিছু বেশী করা সঙ্গত হতে পারে। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে 'আহলি কিতাব কে লক্ষ্য করে।

"হে আহলি কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কর না আর আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত হক ছাড়া কোন কথা বল না।"

বিদ্‌য়াত কিভাবে চালু হয়

বিদ্‌য়াত চালু হওয়ার মূলে চারটি কার্যকরণ লক্ষ্য করা যায়

প্রথমটি ঃ এই যে, বিদয়াতী তা নিজের থেকে উদ্ভাবিত করে সমাজে চালিয়ে দেয়। পরে তা সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়টি ঃ কোন আলিম ব্যক্তিই হয়ত শরীয়তের বিরোধী একটা কাজ করেছেন, করেছেন তা শরীয়াতের বিরোধী জানা সত্ত্বেও; কিন্তু তা দেখে জাহিল

লোকেরা মনে করতে শুরু করে যে, এ কাজ শরীয়তসম্মত না হয়ে যায় না। এভাবে এক ব্যক্তির কারনে গোটা সমাজেই বিদ্‌য়াতের প্রচলন হয়ে পড়ে।

তৃতীয়টি ঃ এই যে জাহিল লোকেরা শরীয়াত বিরোধী কোন কাজ করতে শুরু করে। তখন সমাজের আলিমগণ সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকেন, তার প্রতিবাদও করেন না, সেকাজ করতে নিষেধও করেন না। বলেন না- যে, এ কাজ শরীয়াতের বিরোধী তোমরা এ কাজ কিছুতেই করতে পারবে না। বিরুদ্ধতা না করার ফলে সাধারন লোকদের মনে ধারণা জন্মে যে, এ কাজ নিশ্চয়ই নাজায়েয হবে না, বিদয়াত হবে না। হলে কি আর আলিম সাহেবরা তার প্রতিবাদ করতেন না। এভাবে সমাজে সম্পূর্ণ বিদয়াত বা নাজায়েয কাজ শরীয়াতসম্মত কাজরূপে পরিচিত ও প্রচলিত হয়ে পড়ে।

চতুর্থটি ঃ বহুকাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌র হুকুমকৃত ও রাসূল (সাঃ)-এর প্রদর্শিত কোন একটি সুন্নাত তা সমাজের লোকদের সামনে বলা হয়নি, প্রচার করা হয়নি। তখন সে সম্পর্কে সাধারণের ধারণা হয় যে, এ কাজই নিশ্চয়ই জায়েয নয়, হুকুম হলে আলিম সাহেবরা কি এতদিন তা বলতেন না! এভাবে একটি শরীয়াতসম্মত কাজকে শেষ পর্যন্ত শরীয়ত বিরোধী বলে লোকেরা মনে করতে থাকে আরএ-ও একটি বড় বিদ্‌য়াত। যেমন- কুরআন আর সুন্নাহর সুস্পষ্ট হুকুম শুধুমাত্র ইসলামী আইন বা শরীয়াহ মুতাবিক রাষ্ট্রীয় সংবিধান হওয়া, শুধুমাত্র আলাহ্‌র আইন দ্বারা বিচার ফায়সালা করা, দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) থাকুক আর না থাকুক সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে এক খলিফার নেতৃত্বে একত্রিত থাকা এবং ইসলামের নামে ফিরকা বা দলাদলি না করা ইত্যাদি। এ সকল কাজ সমূহের ফরয হুকুম থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজের বেশীরভাগ লোকই জানে না যে তারা সকলে আল্লাহর ফরয হুকুম পালন করা ছেড়ে দিয়েছে এবং বিদয়াত নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। ফলে তারা শিরক কুফর ও বিদয়াতে পতিত আছে।

বিদ্‌য়াত প্রচলিত হওয়ার আর একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণও রয়েছে। আর তা হল এই যে, মানুষ স্বভাবতই চিরন্তন শান্তি ও সুখ-বেহেশত লাভ করার আকাঙক্ষী। আর এ কারণে সে বেশী বেশী নেক কাজ করতে চেষ্টিত হয়ে থাকে। দ্বীনের হুকুম আহকাম যথাযথ পালন করা কঠিন বোধ হলেও সহজসাধ্য সওয়াবের কাজ করার জন্যে লালায়িত হয় খুব বেশী। আর তখনি সে শয়তানের ষড়যন্ত্রে পড়ে যায়। নিজ থেকেই মনে করে নেয় যে, এগুলো সব নেক কাজ, সওয়াবের কাজ। সেগুলো শরীয়াতের ভিত্তিতেও বাস্তবিকই সওয়াবের কাজ কি না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবার মত ইল্‌মী যোগ্যতাও যেমন থাকে না, তেমনি সে দিকে বিশেষ উৎসাহও দেখানো হয় না। কেননা তাতে করে চিরন্তন সুখ লাভের স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর তাতেই তাদের ভয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বিশ্বাস করতেন যে, শিরক তাওহীদের পরিপন্থী আর বিদ্‌য়াত সুন্নাতের বিপরীত। শিরক 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমার' এই প্রথম অংশের অস্বীকৃতি। আর বিদয়াত হচ্ছে 'মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ' কালেমার এই শেষাংশের বিপরীত এবং অন্তর থেকে তার অস্বীকৃতি।"

মুসনাদে দারেমী হাদীস গ্রন্থে হযরত হিসনের উদ্ধৃতি রয়েছেঃ "জনগণ তাদের দ্বীনের মধ্যে যে বিদয়াতই চালু করে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের নিকট থেকে অনুরূপ একটি সুন্নাত তুলে নিয়ে যান। পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর তা ফিরিয়ে আনেন না।"

বিদ্য়াত কত প্রকার

সাধারণভাবে মুসলিম সমাজের প্রচলিত ধারণা হলঃ বিদ্য়াত দুপ্রকার। একটি হল ভাল বিদ্আত। আর দ্বিতীয়টির নাম মন্দ বিদয়াত, কেউ কেউ দ্বিতীয়টির নাম দিয়েছে ঘৃণ্যও জঘন্য বিদআত। কিন্তু বিদয়াতের এই বিভাগও বোধ হয় একটি অভিনব বিদয়াত। কেননা বিদয়াতকে ভাল ও মন্দ এই দুইভাবে ভাগ করার ফলে বহু সংখ্যক বিদয়াতই ভাল বিদয়াত হওয়ার পারমিট নিয়ে ইসলামী আক্বীদা ও আমলের বিশাল ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করেছে অগোচরে। রাসূলের যুগে বিদয়াত-এর মধ্যে কোন 'হাসানা' ভাল দিক পাওয়া যায়নি। সাহাবী ও তাবেঈনের যুগেও নয়, রাসূলের বাণীতেও বিদয়াতকে এভাবে ভাগ করা হয়নি।

তাহলে মুসলিম সমাজে বিদয়াতের এ বিভাগ কেমন করে প্রচলিত হল? এর জবাব পাওয়া যাবে হযরত উমর ফারূকের (রাঃ) একটি কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এসম্পর্কে বুখারী শরীফের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী বলেনঃ "আমি হযরত উমর (রাঃ)-এর সাথে রমযান মাসে মসজিদে গেলাম। সেখানে দেখলাম লোকেরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নিজের নিজের নামায পড়ছে। আবার কোথাও একজন নামায পড়ছে, আর তার সঙ্গে পড়ছে কিছু লোক। তখন হযরত উমর (রাঃ) বললেনঃ আমি মনে করছি এ সব নামাযীকে একজন ভাল ক্বারীর পিছনে একত্রে নামায পড়তে দিলে খুবই ভাল হত। পরে তিনি তাই করার ফয়সালা করেন এবং হযরত উবাই ইবনে কায়াবের ইমামতিতে জামায়াতে নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই সময় এক রাত্রে আবার উমর ফারূকের সাথে আমিও বের হলাম। তখন দেখলাম লোকেরা একজন ইমামের পিছনে জামায়াতবদ্ধ হয়ে তারাবীহর নামায পড়ছেন। এ দেখে হযরত উমর (রাঃ) বললেনঃ এতো খুব ভাল বিদয়াত।"

হাদীসের শেষভাগে উল্লিখিত উমর ফারুক (রাঃ)-এর কথাটিই হল বিদয়াতকে দুভাগে ভাগ করার বাক্যটি হল **نعمت البدعة هذه** এর শাব্দিক তরজমা হলঃ এটা একটা উত্তম বিদয়াত। আর একটি বিদয়াত যদি উত্তম হয়, তাহলে আপনা আপনি বোঝা যায় যে, আর একটি বিদয়াত অবশ্যই খারাপ হবে। এ হল এ ব্যাপারের মূল ইতিহাস। এখন অবস্থা হচ্ছে এই যে, যে কোন বিদয়াতকে সমালোচনা করলে বা সে সম্পর্কে আপত্তি তোলা হলে, তাকে বিদয়াত বলে ত্যাগ করার দাবি জানান হলে অমনি জবাব দেয়া হয়, "হ্যাঁ, বিদয়াত তো বটে, তবে বিদয়াতের সাইয়্যেয়া নয়, বিদয়াতে হাসানা' অতএব

ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। বস্তুত বিদয়াতের মারাত্মক দিক-ই হচ্ছে এই। এ কারণে বাস্তবতার দৃষ্টিতে রাসূলের বাণী **كل بدعة ضلالة** 'সব বিদয়াত-ই গোমরাহী' অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা যদি সব বিদয়াত-ই গোমরাহী হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিদয়াত-ই হিদায়াত হতে পারে না। কিন্তু বিদয়াতের ভাগ বন্টন তার বিপরীত কথাই প্রমাণিত হয়। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, রাসূলের (সাঃ) কথা সব বিদয়াতেই গোমরাহী ঠিক নয়। কোন কোন বিদয়াত ভালও আছে। (নাউজুবিলাহ মিন জালিক)। রাসূলের কথার বিপরীত ব্যাখ্যা দানের মারাত্মক দৃষ্টান্ত এর চেয়ে আর কিছু হতে পারে না।

আমাদের বক্তব্য এই যে, মূলত বিদয়াতকে 'হাসানা ও 'সাইয়্যেয়া' দুভাগে ভাগ করাই ভুল। আর হযরত উমর ফারূক (রাঃ)-এর কথা দ্বারা-ও এ বিভাগ প্রমাণিত হয় না। কেননা উমর ফারুকের কথার অর্থ মোটেই তা নয়, যা মনে করা হয়েছে। জামায়াতের তারাবীহ নামায পড়া মোটেই বিদয়াত (নতুন আবিষ্কার) নয়। রাসূলের জামানায় তা পড়া হয়েছে। রাসূলে করীম (সাঃ) দু'তিন রাত তারাবীহর নামায নিজেই ইমাম হয়ে পড়িয়েছেন একথাই সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ

নবী করীম (সাঃ) মসজিদে নিজের নামায পড়ছিলেন। বহু লোক তাঁর সঙ্গে নামায পড়ল। দ্বিতীয় রাত্রিতেও সে রূপ হল। এতে করে এ নামাযে খুব বেশী সংখ্যক লোক শরীক হতে শুরু করল। তৃতীয় বা চতুর্থ রাত্রে যখন জনগণ পূর্বানুরূপ একত্রিত হল, তখন নবী করীম (সাঃ) লোকদের বললেনঃ তোমরা যা করেছ তা আমি লক্ষ্য করেছি। আমি নামাযের জন্যে মসজিদে আসিনি শুধু একটি কারণে। তা হল, এভাবে জামায়াতবদ্ধ (তারাবীহ) নামায পড়লে আমি ভয় পাচ্ছি, হয়ত তা তোমাদের উপর ফরযই করে দেয়া হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ এ ছিল রমযান মাসের ব্যাপার। (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, জামায়াতের সাথে তারাবীহ নামায পড়াবার কাজ প্রথম করেন নবী করীম (সাঃ) নিজে। করেন পর পর তিন রাত্র পর্যন্ত। আর রাসূল (সাঃ) একবার যে কাজ করেছেন এবং পরবর্তীতে সে কাজ করতে নিষেধও করে যাননি সে কাজ কিভাবে বিদয়াত হবে।

তা হলে হযরত উমর (রাঃ) জামায়াতের সাথে তারাবীহ পড়াকে 'বিদয়াত' বললেন কেন? বলা হয়েছে এ কারণে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর সময় জামায়াতের সাথে তারাবীহর নামায পড়া ২-৪দিন পর বন্ধ হয়ে যায়, তারপর বহু কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফত আমলে এ নামায জামায়াতের সাথে নতুন করে চালু করা যায়নি। এরপর হযরত উমর ফারূকের সময় এ জিনিস চালু হয়। এ হিসেবে একে বিদয়াত বলা ভুল কিছু হয়নি এবং তাতে করে তা সেই বিদয়াতও হয়ে যায়নি যা সুন্নাতের বিপরীত, যার কোন দৃষ্টান্ত রাসূলের (সাঃ) যুগে পাওয়া যায় না।

উমর ফারুক (রাঃ) যিনি বিদআতের সবচেয়ে বড় বিরোধী ছিলেন, তিনি বিদয়াত চালু করেছেন কিংবা তাঁর সামনে রাসূল (সাঃ) একবারও করেননি কিংবা অনুমোদন দেননি এমন বিদয়াতী কাজ করেছে লোকেরা আর তিনি কিছু বলেননি একথা অবিশ্বাস্য ।

বিদয়াত সনাক্ত করার উপায়

যে কোন কিছু পরিমাপের জন্য একটি মাপকাঠি বা স্কেল রয়েছে । যেমন ঘরের মেঝের লম্বা মাপার জন্য মিটার এবং গজের ফিতা রয়েছে । রোগীর জ্বর পরিমাপের জন্য থার্মোমিটার রয়েছে । ঠিক তেমনি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইসলাম দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোগ করা যে কোন বিষয় (বিদ'আত) সনাক্ত করার জন্য একটা মাপকাঠি বা স্কেল দিয়েছেন । আর এই মাপকাঠি হল আল কুরআন ও সহীহ হাদীস । বড় আলেম, বুযুর্গ, পীর বাবা, মুরুব্বী যা কিছু বলল বা করলো বা করতে উপদেশ দিল আমার কাছে আল্লাহ্র তরফ থেকে যে মাপকাঠি বা স্কেল (কুরআন ও সুন্নাহ) দেয়া আছে তাতে যাচাই করে দেখবো । যদি তা কুরআন ও সুন্নাহতে কোথাও না পাওয়া যায় এবং সাহাবী,তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনরা এ সকল কাজ করেছেন বলে যদি কোন দলিল না থাকে তবে আমি নিশ্চিত হতে পারি এগুলো সব বিদ'আত । কারণ বুযুর্গ, আলেম, পীরবাবা যা বলে তাই দলিল না, তারা যা বলছে বা করছে বা করতে বলছে তা প্রমাণের জন্য কোরআন আর সুন্নাহর দলিল দরকার ।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমার সময়ের লোক অর্থাৎ সাহাবাগণ, তারপর আগমনকারী (তাবেঈন) ব্যক্তিগণ তারপর আগমনকারী (তাবে-তাবেঈন) ব্যক্তিগণ উত্তম ।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম ইব্রাহীম নখঈ বলেন, "কোন ব্যক্তি বা দলের গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে তার আমল সাহাবায়ে কিরামের আমলের বিপরীত ।"

অতএব, সাহাবাগণ, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন গন যেসব কাজ করেননি সেই সব কাজ আলেম, অলি-আল্লাহ, হুজুর কেবলা, পীরবাবার নামে সওয়াবের আশায় শুরু করার নামই বিদ'আত । এখানে আমরা বর্তমান সমাজে বহুল প্রচলিত কিছু বড় বড় বিদয়াতের নাম উল্লেখ করব যেগুলির কোরআন আর সুন্নাহর কোন দলিল তো নাই উপরন্তু সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনদের মাঝেও কেউ কোনদিন এ সকল কাজ করেছে বলে দলিল পাওয়া যায়নি । এ সকল বিদ'আতের কিছু কিছু বিষয় আছে যা সরাসরি শিরক, কোন কোনটি কুফর আর কোন কোনটি হারাম পর্যায়ে পড়ে ।

কয়েকটি বড় বড় বিদয়াত

১ । তাওহীদ আকিদায় শিরক এর বিদ'আত

২ । মানুষের তৈরী কুফর আইন পালনে শিরক-এর বিদ'আত ।

৩ । দ্বীন পবিত্র বস্তু পক্ষান্তরে রাজনীতি হল নোংরা বিষয় , তাই দ্বীনকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে হবে । এ ধরনের চিন্তা কথা ও কাজও সম্পূর্ণ কুফরী বিদয়াত ।

৪ । আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে অসীলা ধরা শিরকই বিদআত ।

(তাগুত বইয়ের ২য় খন্ডে উপরোক্ত চারটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে)

৫ । মাজার স্পর্শ করে বরকত নেয়া, এতে চাদোয়া টাঙ্গানো, বাতি জ্বালানো, ফুল, খুশবু বা গোলাপজল ছিটানো । নজর নিয়াজ পাঠানো, মাজারকে তাওয়াফ করা, মাজার থেকে পিছনমুখী হয়ে বের হওয়া, মাজার কেন্দ্রিক পুকুরে মাছ, কচ্ছপ, কুমীর ইত্যাদিকে শ্রদ্ধা জানানো এ সকল কাজ কোন কোনটি শিরকী, কোনটি কুফরী এবং হারাম বিদ'আত । এসব কাজের মাধ্যমে মাজার মুর্তিতে পরিণত হয় । আর তখন মাজারে এসব করার অর্থ হবে মুর্তির ইবাদত করা । শিব নারায়নের পূজা আর এ ধরনের পূজার মধ্যে কোনই ব্যবধান নেই । রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "হে আল্লাহ্ আমার কবরকে মুর্তি (প্রতিমা) বানিও না ।"(আহমদ)

৬ । বালা-মুছিবত, চোখের অনিষ্টতা, রোগ শোক থেকে রক্ষা পাবার নিমিত্তে কড়ি-কাটি, তাগা-তাবিজ, বৃক্ষের জড়মূল, পাথর এ বিশ্বাসে ঝুলানো যে এগুলো নিজগুণে তাকে রক্ষা করতে পারবে । এসব কার্যাদি শিরকের অন্তভুক্ত ।

রাসূল (সাঃ) বলেন"যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করবে আল্লাহ্ তাকে পূর্ণতা দেবেন না । আর যে কড়ি ব্যবহার করবে আল্লাহ্ তাকে মঙ্গল দান করবেন না ।" (মুসনাদে আহমদ, হাকেম) হাদীসটি বিশুদ্ধ । "যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করল সে শিরক করল ।"(আহমদ ,ত্বরানী)

৭ । মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা এবং রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) মিলাদের মাহফিলে উপস্থিত হন এ ধরনের আকিদা পোষণ করা প্রথম কাজটি হারাম বিদআত আর দ্বিতীয় আকিদাটি শিরকী বিদ'আত ঃ

মিলাদ একটি বিদয়াত বা কুসংস্কার । এটি ইসলাম বহির্ভূত । বাড়াবাড়ি মূলক নতুন ইবাদত । যা ৬০৪ হিজরীতে ইরাকে উদ্ভাবন করা হয়েছে । মৌলিক বিদয়াত সমূহের সুতিকাগার হল ইরাক । খৃষ্টান সম্প্রদায় ঈসা (আঃ) মিলাদ পালন করে থাকে । ইংরেজী সনকে আরবীতে মীলাদী সন বলা হয় । কেননা মিলাদ তথা জন্মদিন থেকে এ সনের গননা শুরু হয়েছে । মুসলিম সমাজে এ কুসংস্কার খৃষ্টান সমাজ থেকে অনুপ্রবেশ করেছে । রাসূল (সা) শেখানো সালাত ও সালাম তথা দরূদকে ত্যাগ করে তদস্থলে এ কুসংস্কারটি আবিস্কার করা হয়েছে । খৃষ্টান সম্প্রদায় ঈসা (আঃ)-কে সম্মান করতে গিয়ে তাওহীদের সীমানা লংঘন করেছে । নবীকে তারা বানিয়েছে ইলাহ ও মাবুদ । অতিভক্তির এটাই কুফল । খৃষ্টানদের মতই অতি ভক্তি প্রদর্শন করা হয় রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি । অথচ তিনি কঠোরভাবে এ অতিভক্তি থেকে নিষেধ করে গেছেন । "তোমরা আমাকে নিয়ে তেমন বাড়াবাড়ি করো না যেমনি বাড়াবাড়ি

করেছিল খৃষ্টানরা মাসীহ ইবনু মারইয়ামকে নিয়ে।" (বুখারী)। মীলাদ পন্থীরা এ নিষিদ্ধ বাড়াবাড়িটাই করছে।

রাসূল (সাঃ) এর প্রতি প্রত্যেক সালাতেই দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা হয়। প্রতিটি দুআর শেষে তাঁর জন্য সালাম প্রেরণ করা হয়। যখনই কোথাও তার নাম উচ্চারিত হয় মুসলিম মাত্রই তার জন্য পাঠ করে দরূদ ও সালাম। প্রতিটি হাদীস পড়ার সময় তার জন্য প্রেরণ করা দরূদ ও সালাম। সকাল সন্ধ্যায় জুময়ার দিনে শত কোটি মুসলমান তার জন্য দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে থাকে। অতএব বিদয়াত পন্থায় তাঁকে সম্মান জানানোর কোন প্রয়োজন নেই। খৃষ্টানদের অনুসরণে মীলাদ নামে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে নবীর ইবাদত যারা করছে তারা নবীর সম্মান করছে না বরং নবীর আদর্শের সাথে শত্রুতা পোষণ করছে। সকল বিদয়াতই শয়তানের আবিস্কার।

৮। কেবল কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাগদাদ, আজমীর সিলেটসহ দূর-দূরান্ত সফর করা হারাম বিদআত ঃ

রাসূল (সঃ) কবর পরিদর্শন (জিয়ারত) করার উদ্দেশ্যে যাত্রায় বের হওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। অন্যান্য ধর্মে এই ধরনের প্রথা পৌত্তলিক তীর্থযাত্রার ভিত্তি রচনা করে। আবু হুরায়রাহ এবং আবু সাঈদ আল-খুদরী উভয়ে বর্ণনা দিয়েছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছিলেন, "মসজিদুল হারাম (মক্কার কা'বা), রাসূলের মসজিদ এবং আল্-আকসা মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে ভ্রমন করিও না।" [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ]

এ হাদীসটি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটি হুকুম অর্থাৎ অমান্য করা হারাম।

একদা আবু বসরা আল-গিফা'রী এক ভ্রমন থেকে ফিরে আসার সময় আবু হুরায়রাহর সঙ্গে দেখা হলে আবু হুরায়রাহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কোথা থেকে এলেন। আবু বসরা উত্তর দিলেন যে, তিনি আত-তুর (at-Toor) থেকে আসছেন যেখানে তিনি সালাত আদায় করেছেন। আবু হুরায়রাহ বললেন, "তুমি রওয়ানা দেবার আগে যদি আমি তোমাকে ধরতে পারতাম। কারণ আমি আল্লাহর রাসূলকে (সঃ) বলতে শুনেছি, 'তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের জন্য ভ্রমন করিও না'.....। [আহমদ]

. ৯। চিত্রকর্ম ও মূর্তি নির্মাণ ঃ

যারা চিত্রকর্ম করে ও মূর্তি নির্মাণ করে তাদের এবং তার পাশাপাশি যারা ঐগুলি প্রদর্শনের জন্য ঝুলিয়ে রাখে, তাদের সম্পর্কে শেষ পয়গম্বর রাসূল (সাঃ) সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ পরবর্তী জীবনে তাদের চরম শাস্তি দিবেন। রাসূলের (সাঃ) স্ত্রী আয়েশা বিনতে আবু বকর বলেন, "একদিন রাসূল (সাঃ) আমাকে দেখতে এলেন এবং আমার নিভৃত কক্ষটি পাখাওয়ালা ঘোড়ার ছবি বিশিষ্ট একটি উলের পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল। পর্দাটি দেখে তাঁর মুখের রং

পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, "হে আয়েশা, যারা আল্লাহর সৃষ্টি করা কাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তারা কিয়ামতের দিনে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি পাবে। তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তারা যা সৃষ্টি করেছিল সে গুলির মধ্যে প্রাণ আনতে বলা হবে।" রাসূল (সাঃ) আরও বলেন, "যে সব বাড়ীতে ছবি এবং মূর্তি রয়েছে সে সব বাড়ীতে ফেরেশতারা কখনই প্রবেশ করে না।" তখন আয়েশা বললেন, "কাজেই আমরা (পর্দাটি) কেটে টুকরা টুকরা করে ফেললাম, এবং এর থেকে একটা বা দুটা বালিশ বানালাম।" [আল বুখারী এবং মুসলিম সংগৃহীত]

১০। কবরস্থানে কোরআন পড়ার অনুমতি নেইঃ

কারণ রাসূল (সাঃ) অথবা তাঁর সাহাবাগণ পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বিশেষ করে রাসূলের (সাঃ) স্ত্রী আয়েশা যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কবরস্থানের যেয়ে কি পড়তে হবে, তিনি সালাম (শান্তির সম্ভাষণ) এবং প্রার্থনা করতে বলেছিলেন। কিন্ত তিনি তাঁকে আল্-ফাতিহা পড়তে বলেননি।

আবু হুরায়রাহ আরও বর্ণনা দেন যে, রাসূর (সাঃ) বলেছিলেন ঃ "তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না কারণ যে গৃহে সূরা আল্-বাকারা পড়া হয় শয়তান সে গৃহ থেকে পালিয়ে যায়।" [আত-তিরমিযী, আবু দাউদ]

এই ধরনের বর্ণনা কবরস্থানে কোরআন না পড়ার ইঙ্গিত বহন করে। গৃহে কোরআন পাঠ করা উৎসাহিত করা হয়েছে এবং গৃহকে কবরস্থানে পরিণত করা (অর্থাৎ কবরস্থানে কোরআন পাঠ করা উচিত নয়) নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১১। তথাকথিত মারিফাতের দাবীদার ভ্রান্ত সুফী মতবাদে বিশ্বাসীরা মনে করে বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহ্‌র সাথে তাদের ভাষায় বিভিন্ন গাউস, কুতুব, আবদাল, আওতাদের হাত আছে (নাউযুবিল্লাহ)। এ বিশ্বাস শরীয়ত পরিপন্থী শিরক ও কুফরী বিদ'আত ঃ আলাহ তায়ালা বলেন ঃ

"বলুন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।" **(বনী ইসরাঈল ঃ ১১১)**

বিশ্ব জাহানের কোন কাজে সৃষ্টির হাত আছে এটা বিশ্বাস করলে কাফের হয়ে যাবে। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে- আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "যে ব্যক্তি বলল ওমুক ওমুক নক্ষত্রের স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে আমরা বৃষ্টিপাত পেয়েছি, তাহলে সে আমার সাথে কুফর করল এবং গ্রহ নক্ষত্রের উপর ঈমান আনল।" (মুসলিম)

বৃষ্টি হওয়ার পেছনে গ্রহ নক্ষত্রের হাত আছে বলে বিশ্বাসকারী ব্যক্তি যেমন উক্ত হাদীস অনুসারে কাফের তেমনি বিশ্ব পরিচালনার কোন কাজে গাউস, কুতুব ইত্যাদির হাত আছে বলে বিশ্বাসকারী ব্যক্তিও কাফের।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) গাউস সম্পর্কে বলেছেন ঃ

গাউস বা গিয়াস শব্দ ব্যবহারের উপযোগী একমাত্র আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লাহ ব্যতীত আর কেহ নয়। তিনিই একমাত্র অসহায়ের সহায়ক। অতএব কারও জন্য জায়েয নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে ফরিয়াদ পেশ করে, তা সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটতম ফেরেশতা, কোন প্রেরিত নবী হোক না কেন। কারও নিকট রুজীর ব্যাপারে, জীবনে উন্নতির ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া বৈধ নয়।

এদেশের মুসলিম সমাজের একটি শ্রেণী আছে যারা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানীকে (রহঃ) গাউসে আযম বা সাইয়েদুল আগাওয়াস বলে মন্তব্য করে থাকে। অথচ তার যামানায় বা তার সন্তান সন্ততিদের মধ্যে ঐ ধরনের কথার কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইহা নাসারাদের মতই নীতি। ঈসার (আঃ) আসমানে উঠে যাওয়ার পর তাকে নাসারারা আল্লাহর আসনে বসিয়েছিল। অথচ তিনি উহার কোনই খবর রাখেন না, যেমন কুরআনে পাকে সূরা মায়েদার ১১৬ থেকে ১২২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন।

১২। কবরের উপর গম্বুজ, সৌধ বা গৃহ নির্মাণ হারাম বিদ'আত ঃ

রাসূল (সাঃ) কবর চুনকাম করা, তাদের উপর কাঠামো নির্মাণ তাদের উপর লেখা অথবা মাটির উচ্চতা হতে উপরে উঠানো নিষেধ করেছেন। তিনি আরও শিখিয়েছেন যে, কবরের উপর নির্মিত যে কোন কাঠামো ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং কবর মাটির সাথে মিলিয়ে ফেলতে হবে।

আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বর্ণনা দেন যে, তিনি কোন মূর্তি দেখলেই তা ধ্বংস করার জন্য রাসূল (সাঃ) আদেশ দেন। আলী (রাঃ) আরো বলেন, যে সব কবর আশেপাশের জমীন থেকে হাতের তালুর প্রশস্থতার চেয়ে উঁচু সেগুলিও রাসূল (সাঃ) সমান করে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। [মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী]

রাসূল (সাঃ) কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূলের (সাঃ) স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) উল্লেখ করেন যে, যখন আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) ইন্তেকালের সময় হয়ে আসে, তখন তিনি তাঁর মুখমন্ডলে উপর তাঁর ডোরা কাটা আলখাল্লা টেনে দিয়ে বলেছিলেন, "আলাহর অভিশাপ পড়ুক ইহুদী এবং খৃষ্টানদের উপর যারা তাদের পয়গম্বদের কবরকে প্রার্থনার স্থান বানিয়েছে। [বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, আন্-নাসায়ী]

১৩। রাশিচক্রে বিশ্বাস করা শিরকী ও কুফরী বিদ'আত ঃ

রাসুল (সাঃ) বলেছেন- "যে ব্যক্তি কোন গণক অথবা জ্যোতিষীর কাছে গমন করল এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করল তাহলে সে মুহাম্মাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার সাথে কুফর করল।" (আহমদ, মুসলিম)

১৪। শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ, প্রতিকৃতি, নেতৃবৃন্দের মাজার ও তাতে পুস্পস্তবক অর্পন, এক মিনিট নিরবতা পালন করা বিদ'আত ঃ

(ক) পুস্পস্তবক অর্পণঃ মুহাম্মদ (সাঃ) আনিত দ্বীনে পুষ্প স্তবক অর্পনের কোন বিধান নেই। মৃতদের জন্য পুষ্প স্তবক অর্পণ খৃষ্টান জাতির সংস্কৃতি। হিন্দু ধর্মেও মুর্তি বেদীতে পুষ্প স্তবক অর্পন করা হয়। মূলত পুস্পস্তবক অর্পণ মূর্তি পূজার অংশ। এটি একটি ইবাদত যা মূর্তিকে দেয়া হয়। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি সংস্কৃতিতে যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।" (আবু দাউদ)

(খ) এক মিনিট নিরবতা পালনঃ "আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু (হজ্জের মওসুমে) যায়নাব নামক আহমাস গোত্রীয় এক মহিলার কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন, সে কথা বলে না। তিনি বললেন, সে কথা বলে না কেন? লোকেরা বলল-তার হজ্জটি এমন যাতে সে নিরবতা পালন করছে। আবু বকর তাকে বললেন-তুমি কথা বল। তোমার এ নিরবতা পালন অবৈধ। এটি জাহেলিয়াত (শিরক ও অজ্ঞতা) যুগের কাজ। অতঃপর সে মহিলাটি কথা বলল।" (বুখারী)

১৫। কুকুরের ঘেউ ঘেউ, পেঁচার ডাক, যাত্রাকালে খালি কলসী, পিছন দিয়ে ডাকাকে, ঝাড়ু দেখাকে অশুভ লক্ষণ মনে করা বিদআত ঃ

রাসূল (সাঃ) বলেছেন- "কোন কিছুকে অশুভ মনে করা শিরক।" [আবু দাউদ, তিরমিযি]

১৬। মান্যবর ব্যক্তিদের সামনে প্রবেশকালে মাথা নিচু করা কিংবা কদমবুসি (পায়ে ধরে সালাম) এবং কেউ ঢুকলে উঠে দাঁড়ানো ইত্যাদি করা বিদ'আতঃ

সম্মানার্থে মাথা অবনমিত করার দ্বারা আল্লাহ্র ইবাদত করা হয়। যেমন রুকু করা, মানে আল্লাহ্র সামনে মাথা অবনমিত কর। এটি একটি ইবাদত। আল্লাহ্র ইবাদতের কোন অংশ অপর কাউকে দেয়া শিরক। যা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ বলেন "তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ।"

১৭। কোন ওলি বা বুজুর্গ নিঃসন্তানকে সন্তান দিতে পারে এ বিশ্বাস করা শিরকী বিদ'আত ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের অংশকে এরূপ সুরক্ষিত করেছেন যাতে শির্কের ছোট বড় যাবতীয় অংশ হতে উম্মাতগণ সতর্ক হয়ে যায়। একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল ঃ আল্লাহ যদি চান, আর আপনিও যদি চান তাহলে এ কাজ হবে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি আমাকে আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে দিলে? বরং কেবল আল্লাহ যদি চান তাহলে উহা হবে, তিনি না চাইলে কিছুই হবে না। নাসায়ী শরীফে সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এই হাদীস বর্ণিত ঃ "আমি একমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করি এবং অন্য কাহাকেও আমি তার সাথে অংশী করছি না।"

সন্তান দেওয়া আল্লাহর রুবুবিয়াতের একটি কাজ। মানুষ যেমন কারও রূযী, হায়াত, বাড়াতে পারে না, অনুরূপ নবী ফেরেশতা ওলী আলেম যেই হোক না কেন নিঃসন্তানকে সন্তান দিতে পারে না । এরশাদ হচ্ছে-

"আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ ক্ষমতাশীল।" (সূরা আশ শূরা ঃ ৪৯-৫০)

১৮। মানত মানায় শিরক এর বিদয়াত ঃ

"তোমরা যা কিছু খরচ কর বা মানত মান, আল্লাহ্ তার সবকিছুই জানেন। আর জালিমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী কেউ নেই।" (আল বাকারা)

তাফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা লিখা হয়েছে এভাবেঃ মানত হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে করবে বলে কোন কাজ নিজের জন্যে বাধ্যতামূলক করে নেবে শর্তাধীন কিংবা বিনা শর্তে।

মানত হতে হবে কেবল আল্লাহ্‌র জন্যে। যে মানত হবে মাত্র আল্লাহ্‌র জন্যে, কুরআনের ঘোষণানুযায়ী কেবল তাই জায়েয; যে মানত খালিসভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে নয়, তা কুরআনের দৃষ্টিতে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। ইমাম আহমদ মুসনাদে এবং তিবরানি তাঁর **الاوسط** গ্রন্থে বর্ণনা করেছেনঃ নবী করীম (সাঃ) এক কঠিন গরমের দিনে লোকদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এ সময় তিনি একটি একটি লোককে (সম্ভবত কোন মরুবাসীকে) রোদের খরতাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন-কি ব্যাপার; তোমাকে রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি কেন? লোকটি বলল-'আমি মানত করেছি'- 'আপনার ভাষণ শেষ না হওয়া আমি রোদে দাঁড়িয়ে থাকব। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ "বসে পড়ো, এটা তো কোন মানত হল না মানত তো শুধু তাই , যা আল্লাহ্‌র সন্তোষ হাসিল করার উদ্দেশ্য হবে।" (মুসনাদ আহমদ, তিবরানি)

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "মানত মানব-সন্তানকে কোন ফায়দাই দেয় না। দেয় শুধু তাই যা তার তকদীরে লিখিত হয়েছে। বরং মানত মানুষকে তার তকদীরের দিকেই নিয়ে যায়। অতঃপর কৃপণ ব্যক্তির হাত থেকে আল্লাহ্ কিছু খরচ করান। তার ফলে সে আমাকে (আল্লাহকে) এমন এমন কিছু দেয়, যা এর পূর্বে সে কখনও দেয়নি।" (বুখারী)

১৯। মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়া শিরকী বিদয়াতঃ

শায়খুল ইসলাম ইমাম তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন ঃ মানুষ জাতির মধ্যে শির্ক দুই প্রকারে উৎপত্তি হয়েছে। প্রথমতঃ যা বহু আলেমের মধ্যে স্থান পেয়েছে তা হল সৎ লোকের ক্ববরের তাযীম করা। এই উদ্দেশ্যে উহা করা হয় যে, ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর পক্ষ হতে নূর, জ্যোতি এবং বরকত নাযিল হতে থাকে; ঐ ব্যক্তির প্রতি নিজেকে পূর্ণভাবে মুতাওয়াজ্জাহ্ (নিবদ্ধ) করতে পারলে ভক্তের

অন্তরে ঐ জ্যোতি ও বরকত নাযিল হবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর শির্ক হল তারকাপূজারী আমদানীতে। গাইরুল্লাহর ইবাদতের কারণে শয়তান শ্রেণী তাদের সাহায্য করে এবং তাদের অভাব অভিযোগ পূরণ করে। ইরশাদ হচ্ছে-

"আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবেনা, যে তোমার ভাল করতে পারবেনা মন্দও করতে পারবেনা । বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ করো তাহলে তুমিও জালেমদের অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাবে।" (ইউনুছঃ ১০৬)

"তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর উপাসনা করে, যা তাদের না করতে পারে কোনো ক্ষতি, না করতে পারে কোনো উপকার। আর তারা বলে, এরা তো আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সুপারিশকারী। আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে এমন বিষয়ে অবহিত করতে চাও, যে সম্পর্কে তিনি আসমান ও যমীনের মাঝে অবহিত নন? তিনি পুতঃপবিত্র ও মহান সে সমস্ত জিনিস থেকে, যে গুলোকে তোমরা শরীক করছো।" (ইউনুছ ঃ ১৮)

২০। অলৌকিক ক্রিয়াকান্ড ঘটানো বিদয়াত ঃ

বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্। এ সবের ওপর কর্তৃত্বও চলে একমাত্র আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের এ ধরনের কিছু কিছু কাজ করার অনুমতি দেন কখনও কখনও, যে ধরনের কাজকে আমরা "অলৌকিক কাজ' বলে থাকি। এর কতগুলো কাজ এমন, যা নবী-রাসূলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোকেই ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় 'মুজিযা'। তা হয় স্বয়ং আল্লাহ্‌র কুদরাতে ও ইচ্ছায়; নবী-রাসূলের ইচ্ছায় নয়।

কারামত মানে সম্মান-মর্যাদা; কিন্তু এখানে যে কারামতের কথা বলা হচ্ছে, তা এসব নয়। তা হল কোন পীর বা অলী আল্লাহ্ কোন অঘটন ঘটিয়েছে, কোন অস্বাভাবিক কাজ সাধন করে মুরীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে, কে শূন্যে উড়ে গেছে, কে পানির উপর দিয়ে পায়ে হেটে সমুদ্র পার হয়েছে, কে জেলখানার বন্দী থাকা অবস্থায় প্রতিদিন কাবায় গিয়ে নামায পড়েছে, এ সব প্রচারণার মানে কি? এ সব যে একেবারে ফাঁকা বুলি, কেবল অজ্ঞ-মুর্খদের জন্যে তা বলা হয়, তাদের মধ্যেই তা প্রচার করা হয়, এটা যে-কোন সুস্থ বুদ্ধির মানুষই স্বীকার করবেন। মোটকথা, অলী-আলাহ হলেই যে তার কারামত-মানে অলৌকিক ঘটনা ঘটবার ক্ষমতা থাকতে হবে, কারামত হলেই যে সে অলী আল্লাহ্ গণ্য হবে। সব কথাই ভিত্তিহীন। কুরআন-হাদীসে এসব কথার কোনই দলীল নেই। সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় 'দাজ্জাল' অনেক 'কারামত' দেখাবে তাই বলে কি সে অলি আল্লাহ? আল্লাহ তা'য়ালা দাজ্জালকে কাফের বলেছেন।

মূর্খ পীরেরা ততোধিক মূর্খ মুরীদের সামনে নিজেদের যে সব 'কারামত' জাহির করে, প্রকাশ করে যেসব অলৌকিক (?) কাণ্ড-কারখানা, সেগুলো সুস্পষ্টভাবে কুফরি ও শিরকী কথাবার্তা আর কাজ।

২১। সমাজে নারীদের নেতৃত্ব এবং প্রাধান্য বিদয়াত ঃ

ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত, কুরআন দ্বারা ঘোষিত এবং রাসূলে করীম (সাঃ) দ্বারা বাস্তবায়িত। তাতে নারীদের নারী হিসেবে মর্যাদা ও অধিকার পুরাপুরি স্বীকৃত। কিন্তু নারীদের মর্যাদা পুরুষদের উপরে নয় নীচে; প্রথম নয় দ্বিতীয়; নিরংকুশ নয়, শর্তাধীন। এ পর্যায়ে কুরআনের ঘোষণা ঃ

"পুরুষগণ নারীদের উপরে প্রতিষ্ঠিতঃ আল্লাহ্ কতক মানুষকে অপর কতক মানুষের উপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন এই নিয়মের ভিত্তিতে এবং এজন্যও যে, পুরুষরাই তাদের ধন-সম্পদ নারীদের জন্য ব্যয় করে।" (আন নিসা ঃ ৩৩)

রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমার পরে আমার উম্মাতের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকর ফিতনা পুরুষদের উপর আসতে পারে নারীদের প্রাধান্যের কারণে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর কথাটি বর্ণনা করেছেন ঃ যে জনসমষ্ঠি তাদের সামষ্ঠিক গুরুত্বপূর্ণ ও কর্তৃত্ব কোন নারীকে অর্পন করবে, তা কখনই কোন কল্যাণ লাভ করতে পারে না।

২২। কুলখানি, চল্লিশা, জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা বিদয়াত ঃ এরূপ অনুষ্ঠানাদি যা কিনা বর্তমানে আমাদের সমাজে ফরয ওয়াজিবের মত পালন করা হয় তা সম্পূর্ণ বিদয়াত। কারণ এ এরকম কুলখানি, চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার দলিল কুরআনে যেমন নেই, হাদীসেও তেমনি নেই। এমনকি সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনরা তাদের বাপ, মা, দাদা, দাদী আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের মৃত্যুতে এ রকম কুলখানি, চল্লিশার আয়োজন করেছেন বলে কোন দলিলই নেই। এটা সুস্পষ্ট বিদয়াত। অর্থাৎ ভন্ড মাওলানাদের টাকা খাওয়ার ব্যবস্থা।

এ বিদআতটি এসেছে হিন্দুদের থেকে। কেউ মারা গেলে হিন্দুরা চার দিনের দিন **চৌঠা.** চল্লিশ দিন পরে **শ্রাদ্ধ** পালন করে এবং বৎসর শেষে মৃত্যুবার্ষিকীর দিনটিতে তারা **স্মরণ পূজার** মাধ্যমে মিঠাই বন্টন করে এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যদি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এরূপ অনুষ্ঠানাদি পালন মুসলিমদের জন্য পছন্দ করতেন তবে অবশ্যই রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিতেন। অতএব যেহেতু এ সকল কাজের কোন দলিল নেই তাই সকলের উচিৎ একযোগে এ সকল বিদয়াত নিজেদের পরিবারের মাঝে ত্যাগ করা এবং এ সকল বিদয়াতী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

২৩।পয়সা দিয়ে মৃতদের উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করানো হারাম, বিদয়াত ঃ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোন দোয়া-কালাম ও অযিফা পড়ানো হারাম। কারণ, এর উপর কোন ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে সে-ই যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি কি পৌছবে? কবরের পাশে কুরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম

করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'আত। (মারেফুল কুরআন, পৃঃ ৩৫)

২৪। শবে বরাত পালন করা বিদয়াত ঃ শবে বরাত সংক্রান্ত কোন সহীহ হাদীস নির্ভরযোগ্য কোন হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। হাদীস হিসাবে যেটাকে দলিল পেশ করা হয় সেটা মওজু বা বানানো হাদীস। শবে কদর সংক্রান্ত কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে কিন্তু শবে বরাতের কোন উল্লেখ নেই। হিন্দুদের দেওয়ালি (কালি পূজার) অনুরূপ করে পটকা ফুটিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে শিরনী রুটির সমাহারে মনগড়া ইবাদত সমূহের মাধ্যমে শবে বরাত নামক বিদয়াতী অনুষ্ঠানটি এই উপমহাদেশে ব্যাপক প্রচলিত হয়েছে।

২৫। মহরম মাসে আশুরার দিন এবং তার আগের অথবা পরের দিন রোযা রাখা ব্যতীত অন্য যে কোন অনুষ্ঠানাদি আশুরার নামে পালন করা বিদয়াত।

২৬। ঈদে মিলাদুন্নবি, পালন করা হারাম বিদয়াত এবং জশনে জুলুস ইত্যাদি পালন করা শিরক ও বিদয়াত।

২৭। কাফের, পৌত্তলিক, ইহুদী ও খৃষ্টানদের নববর্ষ, ভ্যালেন্টাইন ডে, থার্টি ফাষ্ট নাইট, বৈশাখী মেলা, র‍্যাগ ডে ইত্যাদি উদযাপন করা হরাম, বিদয়াতঃ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অনারবীয় দেশে বসবাস করে সে যদি সে দেশের নর্ববর্ষ, মেহেরজান উদযাপন করে এবং বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখে এবং এ অবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করে তবে কিয়ামতের দিন তাকে তাদের (কাফেরদের) সাথে হাশর করা হবে।

(বায়হাকী, সনদ বিশুদ্ধ। মাজমুয়াতুত তাওহীদ ২৭৩)

২৮। নব উদ্ভাবিত নিম্নলিখিত যিকিরসমূহ বিদয়াত ঃ

(ক) শুধু 'লা ইলাহা' (খ) শুধু 'ইলাল্লাহ' (গ) শুধু 'আলাহ আলাহ্' (ঘ) শুধু 'হু হু' করা। (ঙ) শুধু নাসিকার সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে যিকির।

একই সূরে সম্মিলিতভাবে যিকির করা বিদ'আত। স্পেনের বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনুল ওয়াযযাহ (মৃঃ ২৭৬ হিজরী) রেওয়ায়েতকৃত হাদীসঃ "সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর জীবিত অবস্থায় এইরূপ অবস্থা ঘটেছিল। তার কুফায় অবস্থানকালে জনৈক ব্যক্তি এসে তাকে সংবাদ দিল যে, মসজিদে এক আজব নতুন কর্ম দেখে এলাম। কতকগুলি লোক মসজিদে জামায়েত হয়েছে। উহাদের একজন উপস্থিত মন্ডলীকে সম্বোধন করে বলেছে যে, তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দশবার জোরে জোরে পাঠ কর।' আল্লাহু আকবার জোরে জোরে দশবার পাঠ কর, দশবার করে জোরে জোরে দরূদ পাঠ কর। এর ফলে উপস্থিত জনমন্ডলীরা একই সাথে একই আওয়াজে সুরে ঐ রূপ নিয়মে কালেমা, যিকির এবং দরূদ পাঠ করছে। ঘটনাটা বড় নতুন লাগল দেখে আপনাকে জানালাম। সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তথায় তাড়াতাড়ি উপস্থিত হয়ে

তাদেরকে বললেনঃ তোমরা আমায় চিন কি? আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। তোমরা কি অধিক হিদায়াত প্রাপ্ত নাকি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবাগণ হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত? তোমরা যে নিয়মে এই যিকির করছ উহা আমি তথা সাহাবীগণ রাসূল (সাঃ) এর যুগে কখনো দেখেনি। তারপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ আমি তোমাদেরকে বিদ'আতী ছাড়া আর কিছু মনে করি না। তিনি তাদেরকে- 'তোমরা বিদ'আতী, তোমরা বিদ'আতী এই কথা বার বার বলতে থাকেন এবং মসজিদ হতে বের করে দিলেন। এরপর হতে সাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলতেন ঃ যদি তোমরা কেহ কারো কোন নীতি অনুসরণ করে চলতে চাও তাহলে সে যেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ঐ সমস্ত সাহাবাগণের (রাঃ) নীতি অনুসরণ করে যারা ইন্তেকাল করেছেন, যেহেতু বিদ্যাবুদ্ধি, অন্তরের শুদ্ধতায়, আল্লাহ্ভীরুতায় তারাই ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর উম্মতের সেরা মনীষী। (সুনানে দারেমী)

২৯। ইসলামী নাম দিয়ে দলগঠন (বা ফিরকা) করা হারাম বিদআত ঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ উনার বিখ্যাত পুস্তকদ্বয় **(MAJMOO-UL-FATAWA and AL-UQOOD-UD-DURREEYAH-Letters from the prison)** এ লিখেছেন যারা ইসলামের নামে দল গঠন বা দলাদলি (ফিরকাবাজি) করে তারা 'আহলুল সুন্নাহ্ ওয়াল জামায়াহ'র অর্ন্তভূক্ত নয় বরং তিনি তাদের নাম দিয়েছেন 'আহলুল ফিরকা ওয়াল বিদয়াহ'। মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করা হাদীসের ভাষায় হত্যাযোগ্য গর্হিত অপরাধ। কুরআনের বহু আয়াত এবং হাদীসে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত আমরা সমস্ত বিশ্বের মুসলিমরা একই জাতি এবং এক উম্মাহ। ভাষা, সম্পদ, গায়ের রঙ যাই হোক না কেন সমস্ত দুনিয়ার মুসলিমরা উম্মতে মুহাম্মদ (সাঃ) এবং আমাদের রব এবং ইলাহ হলেন এক আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। আজ ইহুদী, খৃষ্টান আর হিন্দুচক্রের বানানো জাতিসংঘের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে পঞ্চাশের আরো অধিক দেশে ভাগ করে আমাদের মাথার উপর তাবেদার, জাতীয়তাবাদী, তাদেরই পোষ্য কুকুর তাগুত সরকারদের বসিয়ে রেখেছে। আমাদের নিজেদের মাঝে হিংসা বিদ্বেষের বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে তারা তামাশা দেখছে আর যখন যার উপর ইচ্ছা নিজেদের আক্রোশ পূরণ করছে। মুসলিমরা আজ আল্লাহ্র শরীয়াহ দিয়ে নিজেদের রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারছে না। পালন করতে পারছে না জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দেয়া হুকুম আহকাম সমূহ। সমস্ত দুনিয়ার মুসলিমরা নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, দারিদ্রতার করালগ্রাসে পড়ে আছে। অথচ মুসলিমদের পায়ের নীচেই আল্লাহ্ তাআলা দিয়ে রেখেছেন দুনিয়ার সকল প্রাকৃতিক সম্পদের ৬০ থেকে ৭০ ভাগ। কত আশ্চর্যের ব্যাপার সম্পদ মুসলিমদের আর বড়লোক ইহুদী খৃস্টান আর পৌত্তলিকরা! এসকল দুরাবস্থার অন্যতম কারণ হল, মুসলিমদের মাঝে দলাদলি আর ফিরকাবাজি ও কুরআন সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। যারা কুরআন সুন্নাহ কিছুটা বুঝার চেষ্টা করে তারা নিজেরাই একটা দল বানিয়ে নেয় ইসলামের নামে। অথচ উম্মাহকে বিভক্তি করা হারাম। আমরা জানি ৫২টি দেশ

মিলে আঠার শতকে একটি দেশ হয়েছিল যুক্তরাষ্ট **(UNITED STATES OF AMERICA)**। ঐক্য তাদেরকে বর্তমানে অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। ২০০০ সালে আমাদের চোখের সামনে সমস্ত ইউরোপ মিলে (E.U) ইউরো গঠন করল। তারা কি সাদা চামড়া বলে এক হয়েছে? কখনও নয়, কারণ যদি তাই হোত তবে বসনিয়ান মুসলিম আর আলজেরিয়ান ও চেচনিয়ান মুসলিমদের তারা এভাবে গনহত্যা কখনও করতো না। তারা ঐক্য গঠন করেছে কারণ তারা খ্রীস্টান। দুনিয়ায় হিন্দুদেরও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আছে হিন্দুস্থান। দুনিয়ায় ভ্রান্ত আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত শিয়াদের একটি রাষ্ট্র আছে-ইরান। আর আমরা মুসলিমরা বিভ্রান্ত জাতির মত পথ হারা হয়ে ঘুরে মরেছি আর রোজই ইসলামের নামে নতুন দল গঠন করেছি। অথচ কুরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ

"যারা কাফের তারা একে অপরের সহযোগী (এবং) যদি তোমরা (সারা দুনিয়ার মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধভাবে) তা না কর [সহযোগী না হও, এক উম্মাহ হিসাবে এক খলিফার নেতৃত্বে (সর্ব্বোচচ মুসলিম নেতা পুরো মুসলিম বিশ্বের) আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করে তওহীদ বা একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা না কর] তাহলে পৃথিবীতে সৃষ্টি হবে ফিতনা, ফাসাদ, বিপর্যয় ও বিশৃংখলা (শিরক হবে প্রতিষ্ঠিত)।"(আল-আনফাল ঃ ৭২-৭৩) **[Translation taken from : THE NOBLE QURAN -- by DR. MD. MUHSIN KHAN; P-241 (V.8; 73) It has been mentioned in tafsir At-Tabari]**

"তোমাদের এ উম্মত হচ্ছে একই উম্মত এবং আমি তোমাদের রব, কাজেই আমাকেই তোমরা ভয় করো। কিন্তু পরে লোকেরা তাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিয়েছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তার মধ্যে তারা নিমগ্ন হয়ে গেছে। ভালোই, তাহলে ছেড়ে দাও তাদেরকে, ডুবে থাকুক নিজেদের গাফিলতির মধ্যে একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত। তারা কি মনে করে, আমি যে তাদেরকে অর্থ ও সম্মান দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি, তা দ্বারা আমি তাদেরকে কল্যাণ দানে তৎপর রয়েছি! না তাহা নয়, আসল ব্যাপার সম্পর্কে তাদের কোন চেতনাই নেই"। (আল-মুমিনুন ঃ ৫২-৫৬)

"তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য (দলাদলি) সৃষ্টি করো না।" (আশ শুরা-১৩)

"আর তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তোমরা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আলে ইমরান ঃ ১০৩)

রাসূল (সাঃ) এ সমস্ত ফিরকার নেতা এবং তাদের দলের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেনঃ হুদাইফাহ্ বিন আল-ইয়ামান (রাঃ) থেকে দুটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে (বুখারী ও মুসলিম) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের শেষ অংশে রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ

তারপর আমি (হুদাইফাহ্ বিন আল-ইয়ামান) জিজ্ঞেস করলাম ঐ আংশিক ভালোর পর কি আবার মন্দ আসবে? তিনি (সাঃ) জবাব দিলেন "হ্যাঁ দোজখের আগুনের ফটকের আহবানকারীরা (অর্থাৎ ইসলামীদলের

নামধারী ফিরকার নেতারা), যে ব্যক্তিই তাদেরকে ইতিবাচক জবাব দেবে (অর্থাৎ তাদের বানান ইসলামী দলে বা ফিরকায় যোগ দিবে) তারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।" আমি তখন তাকে তাদের সম্পর্কে আমাদের কাছে বিবরণ দিতে বললাম, তিনি বললেন, "তারা আমাদের জাতির লোক হবে, এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে।" (অথাৎ মুসলিম জাতির লোক এবং ইসলামের ভাষায় কথা বলবে) আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম- আমি যদি সে সময় বেঁচে থাকি তাহলে আপনি আমাকে কি উপদেশ দেবেন, তিনি (সাঃ) বললেন, মুসলমানদের মূল অংশের (জামায়াহতুল মুসলিমীন) এবং তাদের ইমামের (খলিফাহ) সাথে লেগে থাকবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম যদি কোন জামায়াহ বা ইমাম (খলিফা) না থেকে তাহলে কি করবো। তিনি জবাব দিলেন "সকল দল থেকে বেরিয়ে যাও এমনকি সেক্ষেত্রে যদি তোমাকে তোমার (তুমি যখন তোমার ঐ অবস্থায় থাক) কাছে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত গাছের তলায় বসে থাকতে হয় তবুও ।"

(BUKHAARI : vol. 4 [no.803] and vol. 9 [no. 206]. MUSLIM [no. 4553])

(বুখারীর হাদীসে বর্ণিত) রাসূল (সাঃ) পুরো উম্মাহকে একটি মানুষের শরীরের সাথে তুলনা করেছেন, একটি শরীরের মাথা একটি হয় অর্থাৎ একজন আমিরুল মুমিনীন বা খলিফার নেতৃত্বে সমস্ত উম্মাহকে সর্বাবস্থায় একত্রিত থাকা আমাদের জন্য ফরয হুকুম। খলিফাকে বাইয়াত না দিয়ে মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু। মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ থাকা বিষয়টি এত জরুরী যে তার জন্য দরকার হলে একজন মুসলিমকেও হত্যা করতে হতে পারে।

আবু সা'ঈদুল খুদরী কর্তৃক বর্ণিত যে নবী (সাঃ) বলেছেন "যদি দুজন খলিফাহ আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি (বাইয়াহ) নেন তবে তাদের শেষোক্ত জনকে হত্যা কর।"

(মুসলিম কিতাবুল ইমারাহ)

তবুও মুসলিমকে দলা-দলি করা যাবে না। কোরআন আর সুন্নাহতে কোথাও একবার ও বলা হয়নি দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) না থাকলে তোমরা আলাদা আলাদা ইসলামী দলে ভাগ হয়ে থাকতে পারবে। এ সংক্রান্ত সকল দলিলে তাফাররাক বা দলাদলিকে সম্পূর্ণ নিষেধ বা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে কঠোরভাবে। তাই দলাদলি করা হারাম বিদয়াত। [এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা আমাদের পরবর্তী বই আল জামায়াহ থেকে পাবেন ইনশাআল্লাহ]

পীর-মুরীদীর বিদয়াত

ইসলামের সুন্নাতী আদর্শে আর একটি মারাত্মক ধরনের বিদয়াত দেখা দিয়েছে- তা হল পীর-মুরীদী। পীর-মুরীদীর যে সিলসিলা' বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে, এ জিনিস সম্পূর্ণ নতুন ও মনগড়াভাবে উদ্ভাবিত। এ জিনিস রাসূলে করীম (সাঃ)-এর যুগে ছিল না, তিনি পীর-মুরীদী করেন নি কখনো। তিনি নিজে বর্তমান অর্থে না ছিলেন পীর আর না ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর মুরীদ। সাহাবায়ে

কিরামও এ পীর-মুরীদী করেন নি কখনো। তাঁদের কেউ কারো 'পীর' ছিলনা এবং কেউ ছিলো না তাদের মুরীদ। তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের যুগেও এ পীর-মুরীদীর নাম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

শুধু তাই নয়। কুরআন হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ পীর-মুরীদীর কোন দলীলের সন্ধান পাওয়া যাবে না। অথচ বর্তমানকালের এক শ্রেণীর পীর নামে কথিত জাহিল লোক ও তাদের ততোধিক জাহিল মুরীদ এ পীর-মুরীদীকে ইসলামের অন্যতম ভিত্তিগত জিনিস বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। আর এর মাধ্যমে অজ্ঞ মুর্খ লোকদের মুরীদ বানিয়ে এক একটি বড় আকারের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে।

শরীয়াত মারিফাত ঃ এ পর্যায়ে সবচেয়ে মৌলিক বিদয়াত হল শরীয়ত ও তরীকতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পর সম্পর্কহীন দুই স্বতন্ত্র জিনিস মনে করা। এতোদূর পতন ঘটেছে যে, শরীয়াতকে 'ইলমে জাহের' এবং 'তরিকত বা মারিফাতকে ইলমে বাতেন বলে অভিহিত করে দ্বীন ইসলামকেই দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর জাহিল তরীকতপন্থী বলতে শুরু করেছে যে, ইসলামের আসলই তরীকত মারিফাত, আর এ-ই হাকীকত। এ হাকীকত কেউ যদি লাভ করতে পারল, তাহলে তাকে শরীয়াত পালন করতে হয় না, সেতো আল্লাহ্‌কে পেয়েই গেছে। তাদের মতে শরীয়াতের আলিম এক, আর মারিফাত বা তরীকতের আলিম অন্য। এই তরীকতের আলিমরাই উপমহাদেশে পীর নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

কিন্তু তাসাউফবাদীরা এ মারিফাতকে কেন্দ্র করে গোলক ধাঁধার এক প্রাসাদ রচনা করেছে। তাদের মতে মারিফাত বা ইলমে বাতেন ইসলামী শরীয়াত থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জিনিস। তাদের মতে রাসূলে করীম (সাঃ) না কি এ মারিফাত তাঁর কোন কোন সাহাবীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর অনেককে দেন নি। তাঁরা আরো মনে করেন, ইলমে বাতেন হযরত আলী (রাঃ) থেকে হাসান বসরী পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর তাঁরই থেকে সীনায়-সীনায় এ জিনিস চলে এসেছে এ কালের পীরদের পর্যন্ত।

এই সমস্ত কথাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা রাসূলে করীম (সাঃ) কাউকেই এ জিনিস শিখিয়ে জান নি, যা এখনকার পীর তার মুরীদকে শিখিয়ে থাকে। তিনি এরূপ করতে কাউকে বলেও যান নি। কোন দরকারী ইলম তিনি কোন কোন সাহাবীকে শিখিয়ে দেবেন, আর অনেক সাহাবীকেই তা থেকে বঞ্চিত রাখবেন- এরূপ করা নবী করীমের নীতি ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তা ছাড়া হাসান বসরী, আলী (রাঃ)এর সাক্ষাত পাননি, তাঁর নিকট থেকে মারিফাত শিক্ষা করা ও খিলাফতের 'খিরকা' লাভ করা তো দুরের কথা। আসলে এ কথাটাই বাতিল। শেষের জামানার ভন্ড লোকেরা এটাকে রচনা করেছে প্রচার ও কবুল করেছে। আর এ ধরনের কথা আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আলামা মুলা আলী আল-কারী আল্লামা ইবনে হাযার আল-আসকালানীর (রহঃ) (৭৭৩হিঃ-৮৫২হিজরী, যিনি বুখারী শরীফের তাফসীর বা ভাষ্য গ্রন্থ 'ফতহুল বারী' লিখেছেন) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ সুফী ও মারিফাতপন্থীরা যে সব তরীকা ও নিয়ম-নীতি প্রমাণ করতে চায়, তা প্রমাণ হওয়ার মত কোন জিনিস-ই নয়। সহীহ, হাসান বা যয়ীফ কোন প্রকার হাদীসেই একথা বলা হয়নি যে, নবী করীম (সাঃ) তাঁর কোন সাহাবীকে তাসাউফপন্থীদের প্রচলিত ধরনে খিলাফতের' খিরকা' (বিশেষ ধরনের জামা বা পোষাক) পরিয়ে দিয়েছেন। সেরূপ করতে তিনি কাউকে হুকুমও করেন নি। এ পর্যায়ে যা কিছু বর্ণনা করা হয়, তা সবই সুস্পষ্টরূপে বাতিল। তা ছাড়া হযরত আলী হাসান বসরীকে 'খিরকা পরিয়েছেন (মারিফাতের খিলাফাত দিয়েছেন) বলে যে দাবি করা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে মনগড়া মিথ্যা কথা।

শাহ ওয়ালী উলাহ দেহলভী এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ মারিফাতের যেসব তরীকা, মুরাকাবা-মুশাহিদা ও যিকির এখনকার পীরেরা তাদের মুরীদদের শিখিয়ে থাকে, তা রাসূলে করীম (সাঃ) বা সাহাবায়ে কিরামের জামানায় ছিল না। উপায়-উপার্জন ত্যাগ করা, তালিযুক্ত পোশাক পরা ও বিয়ে-ঘর সংসার না করা ও খানকার মধ্যে বসে থাকা সেকালে প্রচলিত ছিল না।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এ দর্শনের সঠিক পরিচয় হল অদ্বৈতবাদ (হিন্দুদের আকীদার ভিত্তি)। মানে আল্লাহ্ ও জগত কিংবা স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক ও অভিন্ন বিশ্বাস করা যা কি না ভ্রান্ত আক্বিদা। যা সৃষ্টি তাই স্রষ্টা এবং যিনি স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টি - অদ্বৈতবাদী মতাদর্শের এই গোড়ার কথা। আর তা-ই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব, যা বর্তমানে পীর-মুরীদী ধারায় ইসলামের মারিফাত নাম ধারণ করে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে এবং এ যে স্পষ্ট শিরক তাতে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। বস্তুত ইসলাম এক সর্বাত্মক দ্বীন, মানুষ যখন শরীয়াত মুতাবিক আমল করে, তখন হয় শরীয়াতের আমল। পীর-মুরীদী সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আলফেসানী শরীয়াত ও মারিফাত পর্যায়ে তিনি তাঁর মাকতুবাতে লিখেছেনঃ কাল কিয়ামতের দিন শরীয়াত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাসাউফ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না। জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া শরীয়তের বিধান পালনের উপর নির্ভরশীল।

শরীয়াতের বিধান জানার মাধ্যম -- শরীয়াতে মুহাম্মদীর নীতি ও বিধান বুঝার জন্য আমাদের সামনে দু'টি মাধ্যম রয়েছে। প্রথম হচ্ছে কুরআন মজীদ, আর দ্বিতীয় হাদীস। কুরআন মজীদ সম্পর্কে সকলেই জানেন যে, তা হচ্ছে আল্লাহর কালাম এবং তার প্রতিটি শব্দ আল্লাহর কাছে থেকে এসেছে। হাদীস বললে বুঝায় সেসব বর্ণনা, যা রাসূলে করীম (সাঃ) থেকে আমাদের কাছে এসে পৌছেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সারা জীবনই ছিল কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা। নবী হওয়ার সময় থেকে শুরু করে তেইশ বছর কাল তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কেটেছে মানুষকে শিক্ষা ও পথ নির্দেশ (হেদায়াত) দানের কাজে

এবং আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জী অনুযায়ী জীবন যাপনের পদ্ধতি তিনি মানুষকে শিখিয়ে গেছেন তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে।

ফিকাহ -- কুরআন ও হাদীসের বিধান সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে উলিল ইলম বা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আলেমগণ সাধারণ লোকদের সুবিধার জন্য আইনসমূহ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের লিখিত গ্রন্থরাজিকে বলা হয় 'ফিকাহ'। যেহেতু প্রত্যেক মানুষই কুরআন শরীফের সবগুলো সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝে উঠতে পারে না এবং প্রত্যেকটি মানুষ হাদীস সংক্রান্ত বিদ্যায় এতটা পারদর্শী নয়, যাতে নিজেরা শরীয়াতের বিধান বুঝে নিতে পারে, তাই উলিল ইলমরা বছরের পর বছর মেহনত করে, চিন্তা-গবেষণা করে 'ফিকাহ' শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন।

তাসাউফঃ ফিকাহর সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য কার্যকলাপের সাথে। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, আমাকে যেভাবে, যে পদ্ধতিতে কোন কাজ করার বিধান দেয়া হয়েছে, সঠিকভাবে তা করছি কিনা। যদি তা সঠিকভাবে পালন করে থাকি, তা হলে মনের অবস্থা কি ছিল, তা নিয়ে ফিকাহর কিছু বলবার নেই। ইবাদতের সময় মনের অবস্থার সাথে যার সম্পর্ক সে জিনিসটিকে বলা হয় তাসাউফ (কুরআন শরীফে এ জিনিসটির নাম দেয়া হয়েছে 'তাযকিয়া' ও 'হেকমত' হাদীসে একে বলা হয়েছে 'ইহসান ' এবং পরবর্তী লোকেরা একে অভিহিত করেছেন 'তাসাউফ'নামে।) , যেমন কেউ সালাত আদায় করছে, সেখানে ফিকাহ কেবলমাত্র এতটুকুই দেখেছে যে, সে ঠিক মত ওযু করল কিনা। কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াল কিনা, সালাতের সবগুলো অপরিহার্য শর্ত পালন করল কিনা, সালাতের মধ্যে যা কিছু পড়তে হয় তা সে পড়ল কিনা এবং যে সময়ে যে কয় রাকায়াত সালাত নির্ধারিত রয়েছে, ঠিক সেই সময়ে তত রাকায়াত পড়ল কিনা। যখন এর সবগুলো শর্ত পালন করা হল তখন ফিকাহর দৃষ্টিতে তার সালাত পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু এক্ষত্রে **তাসাউফ** দেখে যে, এ ইবাদতে তার দিলের অবস্থা কি ছিল?সে আল্লাহর দিকে নিবিষ্টচিত্ত ছিল কিনা ? তার দিল পার্থিব চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত ছিল কিনা? সালাত থেকে তার অন্তরে আলাহর ভীতি, তাঁর হাযির-নাযির থাকা সম্পর্কে প্রত্যয় এবং একমাত্র তারই সন্তোষ বিধানের আকাংখা পয়দা হয়েছিল কিনা ? এ সালাত তার আত্মাকে কতটা পরিশুদ্ধ করেছে ? তার চরিত্র কতটা সংশোধন করেছে ? তাকে কতটা সত্যসাধক ও সৎকর্মশীল মুসলিম করে তুলেছে ? সালাতের সত্যিকার লক্ষ্যের পথে যেসব বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে, একজন লোক তার যতটা পরিপূর্ণতা হাসিল করল, তাসাউফের দৃষ্টিতে তার সালাত ততটা বেশী পূর্ণতা লাভ করেছে। আর সে দিক দিয়ে যতটা দুর্বলতা থেকে যাবে, তারই জন্য তার সালাতকেও ততটা দুর্বল বলে ধরা হবে। একটি দৃষ্টান্ত থেকে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা যায়। যখন কোন বিশেষ ব্যক্তি কারো সাথে সাক্ষাত করে তখন সে দু'টি দৃষ্টিভংগিতে তার প্রতি নযর করে । এক হচ্ছে ঃ লোকটি পূর্নাংগ ও স্বাস্থ্যবান কিনা ; অন্ধ, কানা, খোঁড়া, তো নয়। লোকটি সুশ্রী বা কুশ্রী ; তার পরিধানে ভাল কাপড়-চোপড়, না

ময়লা জীর্ণ কাপড়, দ্বিতীয় হচ্ছে ঃ তার চরিত্র কি ধরনের, তার স্বভাব ও অভ্যাস কিরূপ, তার জ্ঞান-বুদ্ধি কি প্রকারের। সে আলেম না জাহেল, সৎ না অসৎ। এর মধ্যে প্রথম নযরটি হচ্ছে ফিকাহর নযর, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাসাউফের নযর। বন্ধুত্বের জন্য যখন কোন লোককে কেউ পছন্দ করতে চেষ্টা করবে, তখন তার ব্যক্তিত্বের দু'টি দিকই যাচাই করে দেখতে হবে। তার ভেতর ও বাইরের দু'টি দিকই সুন্দর হোক এ হবে তার আকাংখা । এমনি করে ইসলামেও যে বাঞ্ছিত জীবনের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে বাইরের ও ভিতরের উভয়বিধ বিশ্বাসের দিক দিয়ে শরীয়াতের বিধি-বিধানের আনুগত্য করতে হবে।

এ দৃষ্টান্ত থেকে ফিকাহ ও তাসাউফের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, পরবর্তী যামানায় যেখানে জ্ঞান ও চরিত্রের বিকৃতি হেতু বহুবিধ অনাচার জন্ম লাভ করেছে সেখানে তাসাউফের পবিত্র রূপকেও বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। বিভ্রান্ত জাতিসমূহের কাছ থেকে ইসলাম বিরোধী দর্শনের (গ্রীক দর্শন, প্রাচীন মিশরিয় দর্শন ও ভারতীয় বেদান্ত দর্শন) শিক্ষা লাভ করে মানুষ তাকে তাসাউফের নামে ইসলামের মধ্যে দাখিল করে নিয়েছে। কুরআন ও হাদীসে যার অস্তিত্ব নেই, এমনি বহু বিচিত্র ধরনের বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি তারা তাসাউফের নামে চালিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের লোকেরা ধীরে ধীরে নিজেদেরকে শরীয়তের আনুগত্য থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। তাঁদের মতে তাসাউফের সাথে শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে আরেকটি ভিন্নতর জগত বিরাজ করছে। পীর ও সুফীরাই এ ধরনের মত পোষণ করে থাকে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপ্রসূত। অথচ পূর্বের কোন যুগেই 'ইলমে তাসাউফ বা শুধু তাসাউফ এ নামের কোন ইলম ইসলামে ছিল না, মুসলমানরা জানত না। 'ইসলামে শরীয়াত ও মারিফত দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়'-এ ধারণা এক অতি বড় বিদয়াত। যেমন অতি বড় বিদয়াত হচ্ছে ইসলামে ধর্ম আর রাজনীতিকে দুই বিচ্ছিন্ন জিনিস মনে করা। ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন করে রাজনীতির ক্ষেত্রে ফাসিক ফাজির-জালিম লোকদের কর্তৃত্ব কায়েম করা হয়েছে। আর দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে শুধু নামায-রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে। অনুরূপভাবে শরীয়াত আর তরীকতকে বিচ্ছিন্ন করে সৃষ্টি হয়েছে এক শ্রেণীর জাহেল পীর। মুসলিম সমাজে চলেছে পীরবাদ নামে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মুশরিকী প্রতিষ্ঠান। এ পীরবাদ চিরদিনই ফাসিক-ফাজির-জালিম শাসকদের, রাজা-বাদশাদের আশ্রয়ে লালিত-পালিত শাখায় পাতায় সুশোভিত হয়েছে। সাধারণত পীরেরা চিরদিনই এ ধরনের শাসকদের সমর্থন দিয়েছে। তারা কোন দিনই জালিম-ফাসিক শাসকদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করে নি। বরং সব সময়ই 'আল্লাহ আপকা হায়াত দারাজ করে' বলে দু'হাত তুলে তাদের জন্য দোয়া করেছে।

শরীয়তের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্ক থাকবে না, ইসলামে এমন কোন তাসাউফের স্থান নেই। কোন সুফীরই সালাত,সওম, হজ্জ ও যাকাতের আনুগত্য থেকে মুক্তি লাভের অধিকার নেই। সমাজ-জীবন, নৈতিক দায়িত্ব, চরিত্র,

পারস্পরিক আদান-প্রদান, অধিকার, কর্তব্য ও হালাল-হারামের সীমানা সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল যে নির্দেশ দিয়েছেন কোন পীর বা সুফীরই সেই নিয়মের বিরোধী কার্যকলাপের অধিকার নেই। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য করে না এবং তাঁর নির্ধারিত কর্মপদ্ধতির অনুসরণ করে না, মুসলিম সুফী বলে পরিচয় দেয়ার যোগ্য সে নয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি সত্যিকার প্রেমই হচ্ছে তাসাউফ এবং প্রেমের দাবী হচ্ছে এই যে, কেউ যেন আল্লাহর বিধান ও তার রাসূলের আনুগত্য থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত না হয়। ইসলামী তাসাউফ শরীয়াত থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়,বরং শরীয়াতের বিধানসমূহকে সর্বাধিক আন্তরিকতা ও সৎসংকল্প সহকারে পালন করা এবং অন্তরের ভিতরে আল্লাহর প্রেম ও ভীতির মনোভাব সিক্ত ও সঞ্জীবিত করার নামই হচ্ছে তাসাউফ।

শরীয়াত আর তরীকতকে যারা দুটো জিনিস মনে করে নিয়েছে এবং তরীকতের অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় যারা নিমগ্ন হয়েছে, মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ) তাদেরকে জাহেল ও বিভ্রান্ত লোক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আজ জাহেল পীরেরা নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে এবং শরীয়াত পালন ও কায়েমের দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে দূরে খানকা শরীফের চার দেয়ালের মধ্যে সহজ ও সস্তা সুন্নাত পালনের অভিনয় করার জন্যে শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন 'তরীকত' নামের এ নতুন বস্তুর প্রচলন করে চলেছে। পীরদের মুরীদ বানাবার ব্যবসার সবচেয়ে বড় মূলধন হচ্ছে কাশফ ও ইলহামের দোহাই। পীরেরা যখন বলেঃ আমার কাশফ হয়েছে, ইলহাম যোগে আমি একথা জানতে পেরেছি, তখন জাহেল মুরীদান ভক্তিতে গদগদ হয়ে পীরের কদমবুসি শুরু করে। কিন্তু এসব জিনিস যে পীর-মুরীদীর ব্যবসা চালাবার জন্যে হয়, তা বুঝবার ক্ষমতা এই মুর্খ পীরদের মুরীদদের নেই।

কিন্তু জাহেল পীরেরা শরীয়াতের ধার ধারে না। তারা ইলহামের দোহাই দিয়ে জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম ও ফরয-ওয়াজিব ঠিক করে ফেলে। আর অন্ধ মুরীদরা তাই মাথা পেতে মেনে নেয়, শরীয়াতের হুকুমের প্রতি তাকাবার খেয়ালও জাগে না। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়- পীর ও সূফী লোক নিজেরা যেমন সাধারণত জাহেল হয়ে থাকে, মুরীদদেরকেও তেমনি জাহেল করে রাখতে চায় এবং তাদের দ্বীন ইসলাম ও ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে কুরআন হাদীস থেকে জ্ঞান অর্জন করার জন্যে কখনো হিদায়াত দেয় না। পীর কিবলা মুরীদকে মুরাকাবা করতে বলবে, আল্লাহ্‌র যিকির করতে বলবে এবং হাজার বার করে বানানো দরূদ শরীফের অজীফা' পড়তে বলবে; কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম দ্বীন-ইসলামের মূল উৎস কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতে তার তরজমা ও তাফসীর বুঝতে এবং আল্লাহ্‌র কথার সাথে গভীরভাবে পরিচিত হতে কখনই বলবে না।

মোগলদের ইসলাম-বিরোধী শাসনামলে মুজাদ্দিদে আলফেসানী যখন দ্বীন-ইসলাম প্রচার এবং বাতিলের প্রতিবাদ শুরু করেন, তখন বাতিল পীরেরা তাঁর এ কাজের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়।

পীরবাদ ও বায়'আত গ্রহণ রীতি

বস্তুত বায়আত করা সুন্নাত মুতাবিক কাজ বটে; কিন্তু পীর-মুরীদীর বায়আত সম্পূর্ণ বিদয়াত, যেমন বিদয়াত স্বয়ং পীর-মুরীদী। বায়আত দিতে হবে এবং বায়আত না দিয়ে মারা গেলে জাহিলিয়াতের মৃত্যু হবে সহীহ হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত সত্য। কিন্তু এই বায়আত দিতে হবে সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে শুধুমাত্র একজন আমীরুল মুমিনীন বা খলিফাকে আনুগত্য করার শপথের জন্য। যেমন নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তিকালের পর খলীফা নির্বাচনী সভায় হযরত উমর ফারুক (রাঃ) সর্বপ্রথম বায়'আত করলেন হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর হাতে।

চিশতীয়া, নকশাবন্দীয়া, মুজাদ্দিদীয়া ও মুহাম্মদীয়া তরীকায় ফকীর হাকীরের হাতে বায়য়াত লওয়ার বর্তমানকালে প্রচলিত এই সিলসিলা এল কিভাবে, এ বায়আতের সাথে নবী করীম (সঃ) সাহাবাদের বায়আতের সম্পর্ক কি? মিল কোথায়? আসলে এ হচ্ছে ইসলামের একটি ভাল কাজকে খারাপ ক্ষেত্রে ও খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার মত ব্যাপার। আর এ কারণেই পীর মুরীদীর ক্ষেত্রে হাতে হাতে কিংবা পাগড়ী ধরে অথবা পাগড়ী ধরা লোকের গায়ে গা মিলিয়ে বায়আত করা, বায়আত করা নানা তরীকায় মুরাকাবা করার জন্যে- সম্পূর্ণ বিদয়াত। আরো বড় বিদয়াত হল মুরীদ ও পীরের কুরআন বাদ দিয়ে 'দালায়েলুল খায়রাত' নামে এক বানানো দরূদ সম্বলিত কিতাবের তিলাওয়াতে মশগুল হওয়া। মনে হয় এর তিলাওয়াত যেনো একেবারে ফরয। কিন্তু শরীয়াতে কুরআন ছাড়া আর কিছু তিলাওয়াত করাকে বড় সওয়াবের কাজ মনে করা, কুরআন অপেক্ষা অন্য কোন মানবীয় কিতাবকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা সুস্পষ্টরূপে এক বড় বিদয়াত।

গদীনশীন হওয়ার বিদয়াত

কোন মতে একজন লোক যদি একবার 'পীর' নামে খ্যাত হতে পারল, অমনি তাঁর বড় পুত্র অবশ্যই তাঁর গদীনশীন হবে। কিন্তু পীরের গদী কোনটি, যার উপর বড় সাহেব 'নশীন' হন। পীর কি কোন জমিদার যে, তার মৃত্যুর পর তার বড় পুত্র বাবার স্থলে জমিদার হয়ে বসবে।

ইসলামে নেই কোন জমিদারী, বাদশাহী; নেই দ্বীন নিয়ে এখানে কোন দোকানদারী ব্যবসা চালাবার অবকাশ। কেউ পীর নামে খ্যাত অমনি তার ছেলেরা 'শাহ' বলে অভিহিত হতে শুরু করে। 'শাহ' মানে বাদশাহ। পীর সাহেব নিজে একজন বাদশাহ; আর তাঁর ছেলেরা হল খুঁদে বাদশাহ, বাদশাহজাদা। এই চিরন্তন নিয়ম আবহমানকাল থেকে চলে আসছে । এ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, পীর-মুরীদীর প্রথাটাই আগাগোড়া একটা জাহিলিয়াতের প্রথা। এ প্রথার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এ প্রথা কিছু মাত্র ইসলামী নয়।

এই পীর ও তার মুরীদরা, এ পীরের সমর্থকরা, হাদিয়া তোহফা ও টাকা-পয়সা যারা দেয়, তারা সকলেই রাসূলে করীম (সাঃ)-এর ঘোষণানুযায়ী আল্লাহ্‌র নিকট

অভিশপ্ত। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলে করীম (সাঃ) এর চারটি কথার তৃতীয় কথা হচ্ছেঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা অভিশপ্ত করিয়াছেন সেই ব্যক্তিকে যে বিদয়াতকারী বা বিদয়াতপন্থীকে আশ্রয় দিয়েছে, সম্মান করেছে এবং সাহায্য সহযোগীতা দিয়েছে।

শীয়া সম্প্রদায় এবং উহাদের মূল উৎসের স্বরূপ

হিজরীর পয়ত্রিশ সনে ওসমান (রাঃ) এর শাহাদতের পর আলী (রাঃ) এর বায়আত সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে মুসলিম জাতির মধ্যে দলীয় কোন্দল ও ঘরোয়া বিবাদের সুত্রপাত হয়। ঐ সময় মুসলিম সমাজে দলীয় কোন্দলের ইন্ধন যোগানোর জন্য এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য যে দুষ্ট শ্রেণীর লোক ইসলামে অনুপ্রবেশ করে উহাদের অধিকাংশ অগ্নিপূজক ও ইয়ামানের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল।

ইসলামে অনুপ্রবেশকারীগণ মুসলিম সম্প্রদায়ের আকীদা, সাহাবাগণ (রাঃ) সম্পর্কে এবং তাওহীদী আকিদায় গন্ডগোল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মতামত যাহির করে এক কুহেলিকার সৃষ্টি করেছে। এরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর মতে- আলী (রাঃ) হচ্ছেন স্বয়ং খোদা (নাউযু বিল্লাহ)। এরা আলীর (রাঃ) আমলেই আত্ম প্রকাশ করে।

আলী (রাঃ) এদের মুখচেনা পান্ডাগুলিকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে মারেন। কিন্তু আবর্জনা শেষ হয়নি। এই দলের সদস্যরা যুগ যুগ ধরে এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক কথা প্রচার করে আসছিল। সে সময় হিন্দুদেরকে বুঝানোর জন্য এরা বলেছিল যে, আলী হলেন বিষ্ণুর দশম অবতার। এরা আলীর নামে একখানা কিতাব রচনা করে নেয়। উহার নাম রাখা হয় মাহদী পুরান। উহাতে উমাচারী বুদ্ধমত এমন কতগুলি শ্লোক, মন্ত্র ও টীকা লিখানো হয় যা সাধারণের বোধগম্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দুদেরকে উহা গ্রহণে আগ্রহী করা।

অপর দলের মতে আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের অংশীদার। আলীর নিকট এমন অনেক গোপন ইলম বা তথ্য ছিল যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল মাত্র তাকে দিয়ে গেছেন। এই সংবাদ প্রমাণ করার জন্য তারা নিজের তথ্য রচনা করেছে।

"আমি ও আলী একই নূরে সৃজিত হয়েছি"। এই হাদিসটি জাফর ইবনে আহম্মদ ইবনে আলী নামক ব্যক্তির প্রস্তুতকৃত। হারুন (আঃ) মুসা (আঃ) এর যেমন নবুয়তের অংশীদার ছিলেন, এই হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত গোপন কথা আলী (রাঃ) নিকট বা মাধ্যমে বলেছেন। তারা এই প্রসঙ্গে কুরআন চল্লিশ পারা বলে দাবী করে তন্মধ্যে দশ পারা আলীর (রাঃ) নিকট ওয়াহী হয় অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দিয়ে যান। এই সুবাদে তারা একটি হাদীস বানিয়েছে যা বহুল প্রচারিত।

"আমি ইলমের শহর, আলী উহার দরজা। অতএব ইলমের ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশপ্রার্থী যেন দরজায় এসে পৌঁছায়।" অর্থাৎ আলীর (রাঃ) মাধ্যমে উহা অর্জন করে। এবং উক্ত ইলম কেবলমাত্র আলীর (রাঃ) ভক্ত শীয়াদের নিকটই আছে। এই হাদীস সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্রে পন্ডিতগণ মন্তব্য করেছেন। ইমাম বুখারী (রাঃ) বলেন ঃ উহার কোনও সঠিক সূত্রই নেই। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ উহা প্রত্যাখ্যাত কথা।

শায়খুল ইসলাম ইমাম তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শীয়া মতবাদের আবিস্কার করেছে, তার ধর্মীয় মনোভাবের ভিত্তি আদৌ ছিল না, বরং তার উদ্দেশ্য বড়ই অসৎ ছিল। বলা হয়, সে যিনদীক ও মোনাফেক ছিল, পরে ইসলাম স্বীকার করে তলে কুফরী মত প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। এদের মাযহাবের ভিত্তি হল মিথ্যা কথার উপর। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম দিয়ে মিথ্যা কথা শরীয়তের বাণী বলে প্রচার করা এবং সহীহ হাদীস সমূহকে অস্বীকার করা। (মাজমু আতুল ফাতাওয়া ত্রদোদশ খন্ড ৩১ পৃষ্ঠা।)

শীয়াদের বদনীতির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক নীতি হল, ব্যক্তি বিশেষকে বাড়াতে বাড়াতে এতদূর পৌছানো যে, যেন তারা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এজেন্ট বা মাধ্যম স্বরূপ। তাই এরা এদের বোযর্গ নামীয় শ্রেণীকে এমন সব উপাধিতে উল্লেখ করে যা কেবল অতিরঞ্জিতই নয়, বরং ইসলামী রীতির বর্হিভূত।

এ পরিপেক্ষিতে শীয়ারা তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে বাবুল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহ আয়াতুল্লাহ ইত্যাদি খেতাবে ভুষিত করে অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পৌছানোর জন্য এরাই সোপন স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলাকে পাবার জন্য এদের দরজায় ধর্ণা দিতে হবে; পরিত্রাণ পাওয়া; হক না হক পথের সবকিছুর এরাই মাধ্যম; এমনকি জগতের সবাই এদের মুখাপেক্ষী, তাই এদের কতিপয় লোককে গাউস উপাধী দেয় কাউকে কুতুব বলে থাকে। শীয়ারা মুসলিমদের আকীদা লন্ডভন্ড করার জন্য বিভিন্ন কথা জাল করেছে এবং হাদীসের নামে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে যার ফলে সাধারণ লোক তো দূরের কথা, অনেক আলেমও ধোঁকা খাচ্ছে।

খারেজী

শীআ মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতবাদের অধিকারী দলটি ছিল খারেজী। এরা ইসলামে সর্বপ্রথম বিদআতী দল এদের বক্তব্যের মধ্যে ছিল ।মু'মিন হবে নিখুত খাটি। যে ব্যক্তি ঐরূপ না হবে সে কাফির-চিরজাহান্নামী ।তাদের মতে পাপ কুফরীর সমার্থক। সকল কবীরা গুণাহকারীকে এরা কাফের বলে আখ্যায়িত করে (যদি তারা তওবা করে গুণাহ থেকে প্রত্যাবর্তন না করে) উপরন্ত সাধারণ মুসলমানকেও এরা কাফের বলতো। কারণ, প্রথমত, তারা পাপমুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত সাহাবীদেরকে তারা কেবল মুমিনই স্বীকার করতো না, বরং নিজেদের নেতা বলেও গ্রহণ করতো।

খলীফাকে কুরাইশী বংশোদ্ভুত হতেই এ কথা তারা স্বীকার করতো না। তারা বলতো, কুরাইশী, অ-কুরাইশী-যাকেই মুসলমানরা নির্বাচিত করে, সে-ই বৈধ খলীফা।

কুরআনকে তারা ইসলামী আইনের মৌলিক উৎস হিসেবে মানতো। কিন্তু হাদীস এবং ইজমার ক্ষেত্রে তাদের মত সাধারণ মুসলমান থেকে স্বতন্ত্র ছিল।

এদের সবচেয়ে বড় দল আযারেকা নিজেদের ছাড়া অন্য সকল মুসলমানকে মুশরিক বলতো। এদের মতে নিজেদের ছাড়া আর কারো আযানে সাড়া দেয়া খারেজীদের জন্য জায়েজ নয়। অন্য কারো জবাই করা পশু তাদের জন্য হালাল নয়; কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও জায়েয নয়। খারেজী আর অ-খারেজী একে অন্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরা অন্য সব মুসলমানের বিরুদ্ধে জিহাদকে ফরযে আইন মনে করতো। তাদের স্ত্রী-পুত্র হত্যা করা এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করাকে 'মোবাহ' মনে করতো। তাদের নিজেদের মধ্যকার যেসব লোক এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না, তাদেরকেও কাফের মনে করতো।

তারা তাদের বিরোধীদের ধন-সম্পদ আত্মসাত করাকে হালাল মনে করতো। মুসলমানদের প্রতি তাদের কঠোরতা এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় তাদের কাছে অমুসলিমরা অধিক নিরাপত্তা লাভ করতো।

মুর্জিয়া

শিআ এবং খারেজীদের চরম পরস্পর-বিরোধী মতবাদের প্রতিক্রিয়া একটি তৃতীয় দলের আকারে প্রকাশ পেয়েছে। এ দলটিকে মুর্জিয়া বলে অভিহিত করা হয়।

এক ঃ কেবল আল্লাহ এবং রাসূলের মা'রেফাতের নামই ঈমান। আমল ঈমানের মূলতত্ত্বের পর্যায়ভূক্ত নয়। তাই, ফরয পরিত্যাগ এবং কবিরা গুণাহ করা সত্ত্বেও একজন লোক মুসলমান থাকে।

দুই ঃ নাজাত কেবল ঈমানের ওপর নির্ভরশীল। ঈমানের সাথে কোন পাপাচার মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। কেবল শিরক থেকে বিরত থেকে তাওহীদ বিশ্বাসের ওপর মৃত্যু বরণই মানুষের নাজাতের জন্য যথেষ্ট।

কোন কোন মূর্জিয়া আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলে যে, শিরক থেকে নিকৃষ্ট যতবড় পাপই করা হোক না কেন, অবশ্যই তা ক্ষমা করা হবে।

এসব চিন্তাধারা পাপাচার ফাসেকী ও অশালীন কার্যকলাপ এবং যুলুম নির্যাতনকে বিরাট উৎসাহ যুগিয়েছে। মানুষকে আল্লাহর ক্ষমার আশ্বাস দিয়ে পাপাচারে উৎসাহী করে তুলেছে। এ চিন্তাধারার কাছাকাছি আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে, আমর বিল মারূফ এবং নাহী আনিল মুনকার-ভাল কাজের নির্দেশ এবং খারাপ কাজে নিষেধ-এর জন্য যদি অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়-তা হলে এটা একটা ফেতনা। সরকার ছাড়া অন্যদের খারাপ কাজে বাধা দেয়া নিঃসন্দেহে জায়েয-কিন্তু সরকারের যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুখ খোলা জায়েয নয়। আলামা আবুবকর জাসসাস এ জন্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায় অভিযোগ করে বলেন, এসব চিন্তা যালেমের হস্ত সুদৃঢ় করেছে। অন্যায় এবং ভ্রান্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তিকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

মুরজিয়া ও জাহমিয়া মতবাদ তারা একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। মুরজিয়ারা 'আমলের দিক দিয়ে ইসলামকে পঙ্গু করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে প্রকাশ করল যে, নামায, যাকাত, রোযা ইত্যাদি ইসলামী আদেশ সংক্রান্ত আমল সমূহের সাথে ঈমানের কোনই সম্পর্ক নেই। ফলে নামায, যাকাত বা রোযা আদায় করলে ঈমানের কোনও উন্নতি সাধিত হয় না বা এসব পুন্য কর্মের দ্বারা ঈমান বাড়ে না। অনুরূপ ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, চুরি ইত্যাদি অন্যায় কাজ ঈমানের জন্য ঈমান কমে যায় না। অতএব আমল সমূহ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে স্বীকার করার পর কোন গোনাহই মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়। মুরজিয়ারা এভাবে শরীয়াতের অনুশাসন বাতিল করে ঈমান কেবল মুখে মুখে উচ্চারণ ও মনে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট বলে প্রচার করল। অতএব যদি কেহ নামাযও পড়ে তার ফজিলত হবে ঈমানের সাথে সম্পর্কহীন পৃথক। অর্থাৎ নামায না পড়লে বা মদ্যপান করলে ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না। এভাবে এরা ইসলামের বিধিনিষেধ পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শিথিলতা ও সুবিধার আমদানী করল।

এদের পর জাহমিয়া গোত্ররা বলল ঃ ঈমান মুখে উচ্চারণের প্রয়োজন হয় না, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট। অর্থাৎ কেবল তাসদীক বিল জিনানা-অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস রাখা।

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) তাদের আক্বীদা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ তাদের বিশ্বাস কালেমা শাহাদাত একবার পাঠ করার পর যত প্রকার অন্যায় করুক ঐ অন্যায়ের শাস্তি ভোগের জন্য আদৌ জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে না।

মুতাযিলা

এ সংঘাত মুখর যুগে একটি চতুর্থ মতবাদও জন্ম নেয়।খারেজী এবং মুর্জিয়াদের মধ্যে কুফর এবং ঈমানের ব্যাপারে যে বিরোধ চলে আসছিল, সে ব্যাপারে এদের নিজস্ব ফায়সালা এই ছিল যে, পাপী মুসলমান মুমিনও নয়, কাফেরও নয়, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।

এছাড়াও অনেক মু'তাযিলা ইসলামী আইনের উৎসের মধ্য থেকে হাদীস এবং ইজমাকে প্রায় বাতিলই করে।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন, খাওয়ারেজ ও মুতাযেলী উভয়ের বক্তব্য হল - "আমি নিশ্চিতরূপে স্বীকার করছি যে, ধর্মীয় অনুশাসনগুলি সমস্তই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যখন ধর্মীয় অনুশাসনগুলি কিয়দংশ ছেড়ে দেয়া হল তখন ঈমানের কিছু অংশ চলে গেল। অতএব যখন কিছু অংশ নষ্ট হল তখন তার ঈমান সম্পূর্ণভাবে চলে গেল। যেহেতু ঈমান অংশযুক্ত বস্ত নয়; উহার কিছু অংশ পরিত্যাগ করলে অন্যান্য অংশগুলি পালন সত্ত্বেও সে মু'মিন থাকবে না, কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে; বিধায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ হবে" মু'তাযিলীদের মতে সে মু'মিনও নয়, কাফিরও নয়। এই মাসআলায় মু'তাযিলীদের সাথে খারেজীদের মতপার্থক্য হয়েছে।

মুতাযেলীগণ আবূ বকর (রাঃ), ওসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এই ৪ জন খলিফার খিলাফত স্বীকার করে থাকে। খারেজীগণ আবূ বকর ও ওমরের (রাঃ) খিলাফত স্বীকার করে। ওসমান ও আলীর (রাঃ) খিলাফত স্বীকার করে না। রাফেযীগণ কেবল মাত্র আলী (রাঃ) ছাড়া প্রথম তিনজন খলীফার খেলাফত আদৌ স্বীকার করে না।

প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতে (আখতার ইলিয়াছ প্রবর্তিত) যোগ দেয়া, চিল্লা দেয়া এবং এজতেমার ময়দানে প্রতিবছর তিন দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা এবং চিন্তা করা ও বলা হজ্জের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ ইত্যাদি সকল কাজসমূহ সুস্পষ্ট বিদয়াত

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের একটি রাজ্য হরিয়ানায় ১৩০৩ হিজরীতে জন্ম প্রচলিত তাবলীগ জামাতের প্রবর্তক আখতার ইলিয়াসের। দাবী অনুযায়ী ১৩৪৪ হিজরীতে দ্বিতীয়বার হজ্বে গেলে, মদীনায় থাকাকালীন অবস্থায় ইলিয়াস (গায়েবী) নির্দেশ পায় যে, "আমি তোমার দ্বারা কাজ নেব।" ফলে ১৩৪৫

হিজরীতে দেশে ফিরে এসে মেওয়াতের একটি গ্রাম নওহে তাবলিগী কাজ শুরু করে।

এই তাবলীগের প্রচলিত ভিত্তি স্বপ্নের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

মাওলানা ইলিয়াস বলেন "আজকাল স্বপ্নে আমার উপর সঠিক জ্ঞানের 'ইলকা' (প্রতিফলন) হচ্ছে। সেজন্য চেষ্টা করো যাতে আমার ঘুম বেশী হয়। তাই মাথায় তেল মালিশের ফলে ঘুমে বাড়তি হল। তিনি আরও বলেন এই তাবলিগের নিয়মও আমার নিকটে স্বপ্নে প্রকাশিত হয়।" (মালফুযাতে মাওলানা ইলিয়াস ৫১ পৃষ্ঠা, তাবলীগী জামায়াত আওর উসকা নিসাব ১৩ পৃষ্ঠা-উর্দু গ্রন্থ)

মালফুযাত ইলিয়াস নামক উর্দু গ্রন্থে ৫০ পৃষ্ঠায় লেখা মাওলানা ইলিয়াসের বক্তব্য "প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতের নিয়ম পদ্ধতি আমি স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছি।" অর্থাৎ বুঝা গেল এটা কুরআন ও সুন্নাহ ও ইজমা কিয়াস সম্মত নয়। বরং মাওলানা ইলিয়াছের কথানুযায়ী প্রচলিত ছয় উছুলী তাবলীগ জামায়াতের মূল উৎস হচ্ছে তার স্বপ্ন।

তার পরবর্তী লাইনের বক্তব্য-

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

তাফসীর খাব মে ইয়ে এলায হুইয়ি কেহ তুম মিছলে আম্বিয়া আলাইহে ওয়াসাল্লাকে লুও কে ওয়াস্তে জাহের কি পাইয়িহু। অর্থাৎ মোঃ ইলিয়াস বলেন, "কুনতুম খাইরা উম্মাতিন এ আয়াতের তাফসীর স্বপ্ন যোগে আমার উপর এরূপ এলকা (এলহাম) হয় যে, হে ইলিয়াস তুমি নবীদের মতই মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছ।" এখানে "মিছিলে আম্বিয়া" দ্বারা তিনি ইলিয়াস কিসের দাবী করেছেন? কারণ আরবীতে 'মিছল' শব্দটি সমকক্ষতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই মোঃ ইলিয়াস নবীদের সমকক্ষ হবার দাবী করছেন কি? (নাউযুবিলাহ)। এছাড়া উর্দু মালফুজাতের ১২৫ পৃঃ লেখা রয়েছে আমি (ইলিয়াস) উত্তরাধিকার সূত্রে নবুয়্যতের তোহফা প্রাপ্ত হয়েছি (নাউযুবিল্লাহ)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার তরফ থেকে রাসূল (সাঃ) এর আনীত দ্বীন ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ বা ভিত্তি হচ্ছে (১) কালেমা (২) নামায (সালাত) (৩) রোযা (সাওম) (৪) হজ্জ এবং (৫) যাকাত। কিন্তু মাওলানা ইলিয়াস মেওয়াতীর দাবি যে স্বপ্নে ছয় উসুল পেয়েছেঃ (১) কালেমা (২) নামায (৩) একরামুল মুসলেমিন (৪) তাসহিহে নিয়ত (৫) এলেম ও যিকির এবং (৬) তাবলীগ।

অথচ যে কোন মুসলিম রাসূল (সাঃ) আনীত পাঁচ উসুলের যে কোন একটি অস্বীকার করলে বা দ্বীন কায়েমের সুবিধার জন্য নতুন কোন উসুল সংযোগ করলে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়। সূরা মায়েদা তিন নম্বর আয়াত অনুযায়ী দ্বীন পরিপূর্ণ এবং যে কেউ এ দ্বীনের মূল ভিত্তি পরিবর্তন আনার চেষ্টা অধিকার রাখে না। অথচ ইলিয়াস মেওয়াতী ইসলামের তিন স্তম্ভ বাদ দিয়ে

নতুন চার স্তম্ভ সংযোজন করে মারাত্মক ফেৎনা সৃষ্টি করেছেন যা আমাদের প্রত্যেক মুসলিমদের চিন্তার বিষয় ।]

শরীয়াতে স্বপ্নের যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকেই প্রমাণিত । এ পর্যায়ে দুটো হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে -

একটি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, নবুয়্যাতের কোন কিছুই বাকী নেই সবই শেষ হয়ে গেছে, এখন আছে শুধু 'সুসংবাদ-দাতাসমূহ । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ সুসংবাদ-দাতাসমূহ বলতে কি বোঝায়? নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ তা হল ভাল স্বপ্ন ।

দ্বিতীয় হাদীস হল হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেনঃ রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ ভাল স্বপ্ন নবুয়্যাতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ মাত্র ।

প্রথম হাদীস থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ভাল স্বপ্ন বান্দার জন্যে সুসংবাদ লাভের একটি মাধ্যম মাত্র । আর দ্বিতীয় হাদীস থেকে জানা যায় যে,নবুয়্যাতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ মর্যাদার অধিকারী হল এই 'শুভ স্বপ্ন' । তা হলে বাকি পয়তাল্লিশ ভাগ কি? তা হল রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আলাহর তরফ থেকে নবুয়্যাতের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ । অতএব এই কুরআন ও সুন্নাহই হল দ্বীনের আসল ও মূল ভিত্তি । তা-ই বাস্তব জিনিস, তার মুকাবিলায় স্বপ্নকে পেশ করা কল্পনা বিলাসী লোকদেরই কাজ ।

যারা বাস্তব জীবনের ব্যাপারগুলোকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক, তাদের কর্তব্য হল স্বপ্নের পেছনে না ছুটে কুরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি করে অগ্রসর হওয়া । যারা কুরআন হাদীসের বাস্তব বিধানকে ভিত্তি করে কাজ করে না, তা থেকে গ্রহণ করে না জীবন পথের নির্দেশ ও ফয়সালা; বরং যারা স্বপ্নের ভিত্তিতেই দ্বীন ও দুনিয়ার ফয়সালা গ্রহণ করে, তারা আসলেই ঈমানদার নয়, ঈমানদার নয় আল্লাহ্‌র কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাতের প্রতি । অতএব তারা বিদয়াত পন্থী, বিদয়াতী লোক ।

প্রচলিত (আখতার ইলিয়াছ প্রবর্তিত) তাবলীগী নেসাব পরিচিতি

আখতার ইলিয়াছ প্রবর্তিত তাবলীগ জামাতের প্রতি সাধারণ মুসলমানদের আকৃষ্ট করার জন্য ভারতের উত্তর প্রদেশের শাহারানপুর জেলার কান্ধেলাহ নিবাসী মাওলানা যাকারিয়্যা নয়খানা বই লেখেন উর্দু ভাষায় ।

১ । হেকায়েতে সাহাব । ২ । ফাযায়েলে নামায ৩ । ফাযায়েলে তাবলীগ ।
৪ । ফাযায়েলে যিকর ৫ । ফাযায়েলে কুরআন । ৬ । ফাযায়েলে রমাযান ।
৭ । ফাযায়েলে দরূদ । ৮ । ফাযায়েলে হাজ্জ ৯ । ফাযায়েলে সাদাকাত ।

এর মধ্যে এক থেকে সাত নম্বর বইগুলোর একত্রে কয়েক বছর আগে নাম ছিল তাবলীগী নেসাব ১ম খন্ড এবং আট ও নয় নম্বর একত্রে নাম ছিল তাবলীগী নেসাব ২য় খন্ড । পরে "মুসলমা নুঁকী পাস্তী কা ওয়া-হিদ ইলজ নামক বইটি

সংযোজন করে তাবলীগী নেসাবের নাম পাল্টে যায় । ফাযায়েলে আমাল নামে তা ছাপা হয়েছে ।

এই তাবলীগ জামাতের বযুর্গরা তাদের অনুসারীদের আল্লাহ্‌র কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের হাদীসের অনুবাদ পড়ার বদলে তারা তাবলীগী নেসাব তথা ফাযায়েলে আমাল পড়তে উৎসাহিত করে ।

এই বইগুলো তিনভাবে বিভক্ত - ১ । সামান্য অংশ কুরআনের আয়াত সম্বলিত ২ । কিছু অংশ হাদীস সন্নিবিষ্ট ৩ । বেশী অংশ বোযর্গদের কাহিনীতে পরিপুষ্ট । প্রথমভাগে ফাযায়ালে কিতাবে সমবেত কুরআনের আয়াত সমূহের অনেকগুলিতেই ইচ্ছাকৃত তরজমা বিকৃত করা হয়েছে । যেমন -

সূরা কামারের সতের নম্বার আয়াত ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مد كر

এর অনুবাদে মাওলানা যাকারিয়া উর্দুতে(যা একই বাংলা তরযমাতে) লিখেছে যার অর্থ দাড়ায় "আমি কালামে পাককে মুখস্ত করার জন্য সহজ করে দিয়েছি । কেউ আছে কি মুখস্তকারী" । (ফাযায়েলে আমালের ফাযায়েলে কুরআন ৫৫ পৃষ্ঠা দারুল কিতাব পৃষ্ঠা-৮৯)

উক্ত আয়াতের দু'টি শব্দ 'যিকর' এবং 'মুদ্দাকির'-এর অর্থ মাওলানা যাকারিয়্যা করেছেন মুখস্থ করা এবং মুখস্থকারী । কিন্তু আল কুরআনের বিশ্ববিখ্যাত এবং সর্বজনমান্য তাফসীর ইবনে কাসীর এবং তাফসীর ইবনে জারীরে ওর অর্থ করা হয়েছে উপদেশ গ্রহণ এবং উপদেশ গ্রহণকারী । সূরা কামারের এই আয়াতটি একই সূরাতে চারবার উল্লেখিত হয়েছে । আর তা চারটি কাওম নূহ ও আদ এবং সামুদ ও লূত এর জাতি সমূহের দুস্কৃতি ও তাদের চরম শাস্তির লোমহর্ষক পরিণতি বর্ণনার পর উক্ত আয়াতটি বারংবার উল্লেখ করে কোরআনের পাঠককে ঐ সব জাতির পরিণাম জেনে শিক্ষা নেবার জন্য আল্লাহ্‌ বলেছেন আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য এই কুরআনকে সহজ করেছি । অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? উক্ত আয়াতগুলোর আগে পিছের বক্তব্য সামনে রেখে ওর তরজমা 'মুখস্থ করা' ও 'মুখস্তকারী ঠিক হয় কি? অতএব এইরূপ অনুবাদক কুরআনের আয়াতের অর্থ বিকৃতকারীর পর্যায়ে পড়ে যায় না কি?

ফাজায়েলে আমলের দ্বিতীয় অংশ হাদীসে রাসূল (সাঃ)-বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ থেকে কিছু হাদীস ব্যবহার করেছে ঠিকই কিন্তু এর সাথে সাথে সব অংশেই বেশীরভাগ যয়ীফ ও মওযু হাদীস সুত্র ছাড়া বর্ণনা করেছে । এগুলির বেশীর ভাগই জাল অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা আর অবশিষ্ট হাদীসগুলি যয়ীফ এগুলি নবীজীর হাদীস কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে । অথচ রাসূল (সাঃ) বলেন তোমরা আমার তরফ থেকে একটি কথা হলেও তা প্রচার কর । আর যে ব্যক্তি (জাল হাদীস প্রভৃতির মাধ্যমে) আমার বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নিক । (বুখারী)

ফাযায়েলে আমলের তৃতীয় অংশ বোযর্গদের (মুরব্বী) আজগুবি, উদ্ভট, কেচ্ছাকাহিনীতে ভরপুর। নুযহাতুল মাজালিশ, রওযুল ফায়িক, মাজালিসুল আবরার, গুলশানে জান্নাত, সামিরাতে ইউসুফ যুলেখা, প্রভৃতি গ্রন্থগুলি থেকে আজগুবি সব কেচ্ছাকাহিনী সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ সকল বই ভ্রান্ত আকীদা সূফী চরিত্রের লেখকদের দ্বারা লিখিত। এ বইগুলিতে ভক্তির অতিমাত্রায় আজগুবি উদ্ভট তথ্য লেখা আছে। যার বেশিরভাগই অবাস্তব এবং কল্পনার অতীত এবং শিরকী বিষয়ও বহু আছে। একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কখনও এসব অতিভক্তি দ্বারা লিখিত কল্পনা কাহিনীগুলিতে বিশ্বাস করতে পারে না। তাই এ বইয়ের বেশীরভাগ কাহিনী অনাস্থাযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য। সেই সঙ্গে সঠিক আকিদার বিরোধী।

একবার ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন, মানুষকে ইসলামের পথে আহবান জানানোর জন্য কুরআন ও সুন্নাহতে দলিল কম রয়েছে কি। কুরআনে পাকে আমপারার সূরা সমূহতে পরকালের জীবন এবং ইসলাম ছাড়া অন্য যে কোন পথে চলার ভয়ানক পরিণতির অর্থাৎ জাহান্নামের যে সুবিস্তর বর্ণনা রয়েছে তা একজন মানুষকে ভ্রান্ত আকিদার কাজ থেকে ফিরে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে দাখিলের দাওয়াত দেয়ার জন্য কি যথেষ্ঠ নয়। এছাড়াও মুহাম্মদ (সাঃ) এর সুন্নাহ থেকে এ সংক্রান্ত অসংখ্য বিস্তারিত বণর্ণার দলিল আজ আমাদের সামনে উপস্থিত সহীহ হাদীস আকারে। তাছাড়াও রাসূল (সাঃ) এর অসংখ্য সাহাবী যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রাদিয়াল্লাহু আনহু (বা আল্লাহ তাদের উপর রাজি আছেন) বলেছেন, উনাদের জীবনের হাজার হাজার শিক্ষণীয় ঘটনা যা কিনা দলিল আকারে আমাদের সামনে উপস্থিত, তা কি যথেষ্ঠ নয়। কেন আশ্রয় নিতে হবে বযুর্গদের আজগুবি কিচ্ছা কাহিনীতে যা কিনা সত্য না মিথ্যা তা প্রমাণের জন্য আমাদের হাতে কোন দলিল নেই।

একজন সত্যিকার মুসলিম জানে-**আলেম যা বলল তা দলিল না, আলেম বা বযুর্গ যা বলল তা প্রমাণ করার জন্য কোরআন ও সুন্নাহর দলিল দরকার**। তাই বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূল (সাঃ) বলেছেন, তিনি আমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছেন; একটি কিতাব আলাহ (আল কুরআন) ও সুন্নাতে রাসূল (সহীহ হাদীস সমূহ)। আমাদের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ এ দুটিকে আকড়ে থাকবে ইনশাল্লাহ পথভ্রষ্ট হবে না।

কল্প কাহিনীর কয়েকটি উদাহরণ উর্দু মূল বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সহ দেয়া হল

: ফাযায়েলে আমল বইয়ের ভূমিকায় মাওলানা যাকারিয়া লিখেছেন যে- হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াছ আমাকে তাবলীগে দ্বীনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আয়াত ও হাদীস লিখিয়া পেশ করিতে আদেশ করেন। **এই বুযুর্গগণের সন্তুষ্টি হাসিল করা আমার মত গোনাহগারের জন্য গোনাহ মাফি ও নাজাতের ওসীলা এই আশায়** দ্রুত রচনা করতঃ এই উপকারী কিতাবখানী খেদমতে পেশ করিতেছি। (ভূমিকাটি লক্ষ্য করেছেন কি)

১। ফাযায়েলে নামাযে একজন সাইয়েদ সাহেবের কিসসা লেখা আছে যে, তিনি বার বছর পর্যন্ত একই অযুতে সমস্ত নামায পড়েছেন এবং পনের বছর তাঁর শোবার সুযোগই ঘটেনি। কয়েক দিন এমনও কাটতো যে, কোন জিনিস চাখারও সুযোগ তাঁর হোত না (ফাযায়েলে আ'মালের ফাযা-য়েলে নামায ৭২পৃঃ অনুবাদ ৭৯ পৃষ্ঠা)।

মাওলানা যাকারিয়্যা উক্ত ঘটনাটি বিনা বরাতে লিখেছেন। এটা তাঁর তৈরী করা কিসসা কিনা আল্লাহ্ জানেন। কোন যোগী, সন্ন্যাসী ও সুফীর পক্ষেও এটা সম্ভব কি যে, তিনি ফজর থেকে এশা পর্যন্ত বার বছর পেশাব-পায়খানা করেননি? আর পনের বছর মোটেই ঘুমাননি? সেই সঙ্গে তিনি অনাহারেও থেকেছেন?

২। তাবলীগী নেসাব ও পরোক্ষ শির্কের প্রাদুর্ভাব ঃ ফাযায়েলে দরূদ শরীফের ছেচল্লিশ নম্বর কাহিনীতে লেখা আছেঃ হযরত সুফিয়্যান সওরী একটি যুবককে দেখেন যে, সে যখনই একটি পা তুলছিল কিংবা রাখছিল তখনই সে পড়ছিল; আলা- হুম্মা সলি-আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ। সওরী সাহেব যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার এই দরূদ কি জিনিস? ছেলেটি বললো, আমি আমার মায়ের সাথে হজ্জে গিয়েছিলাম। তিনি সেখানে মারা যান। তাঁর মুখ কালো হয়ে যায় এবং তাঁর পেট ফুলে যায়। যার ফলে আমি অনুমান করলাম যে, কোন বড় গোনাহ হয়েছে। তাই আমি আল্লাহ্ জাল্লা শা-নুহুর কাছে দুআর জন্য হাত তুললাম। ফলে দেখলাম যে, তাহামাহ (হিজায) থেকে একখন্ড মেঘ এল। তা থেকে একজন লোক বের হল। তিনি তাঁর মুবারক হাতটি আমার মায়ের মুখে ফেরালেন। যার কারণে তা উজ্জ্বল হয়ে গেল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কে? যিনি আমার এবং আমার মায়ের বিপদ দূর করলেন? তিনি বললেন, আমি তোর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)। আমি বললাম, আমাকে কোন অসিয়্যত করুন। তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, যখনই তুমি কোন পদক্ষেপ রাখবে কিংবা তুলবে তখনই পড়বেঃ আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আ-লা আলি মুহাম্মদ (ফাযায়েলে আমালের দরূদ ১০৯ পৃষ্ঠাও তাবলীগী নেসাবের ফাযায়েলে দরূদ ১২০-১২১ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইন্তেকালের পর তাঁর পক্ষে কারো বিপদের গায়েবী খবর জানার ধারণা পোষণ করা শিরক। তাঁর ইন্তেকালের পর মেঘের মধ্যে তাঁর উড়ে এসে কারো বিপদ উদ্ধার করার ধারণাও শিরক।

৩। **হেকায়াতে সাহাবাতে লেখা হয়েছেঃ-** রাসূল (সাঃ) একবার শিঙ্গী লাগান এবং যে রক্ত বের হয়, তা তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে দেন যে এটাকে কোথাও পুঁতে দাও। তিনি গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন যে, তা পুঁতে দিয়েছি। হুযুর শুধালেন, কোথায়? বললেন, আমি পান কোরে নিয়েছি। হুযুর বললেন, যার শরীরে আমার রক্ত যাবে তাকে জাহান্নামের আগুন ছুঁতেই পারবে না। কিন্তু লোকদের দ্বারা তোমার ধ্বংস রয়েছে এবং তোমার দ্বারা লোকদেরও (ফাযায়েলে আমালের হেকায়াতে সাহাবাহ ১৭২ পৃষ্ঠা এবং তাবলীগী নেসাবের হেকায়াতে সাহাবাহ ১৭৯ পৃষ্ঠা, বাংলা অনুবাদ ২১৪-২১৫পৃষ্ঠা)।

রক্ত সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত জন্তু ও রক্ত এবং শুকরের মাংসকে" (নাহল ঃ ১১৫)। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় রাসূল (সাঃ) কখনও এমন কিছু হালাল করেননি যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন।

৪। ফাযায়েলে সাদাকাত ও আজগুবি কেচ্ছার সংঘাত ঃ ফাযায়েলে সদকাতে আছে, শায়খ আবু ইয়াকুব সান্নুসী বলেন, আমার কাছে এক মুরীদ এল এবং বলতে লাগলো যে, আমি কাল যোহরের সময় মরে যাব। তাই দ্বিতীয় যোহরের সময় সে মসজিদুল হারামে এল, তাওয়াফ করলো এবং কিছুদূর গিয়ে মরে গেল। আমি তাকে গোসল দিলাম। এবং দাফনও করলাম। যখন আমি তাকে কবরে রাখলাম, তখন সে চোখ মেলে দিলো। আমি বললাম যে, মরার পরও জীবন আছে নাকি? সে বললো আমি জ্যান্ত রয়েছি। আর আল্লাহ্র প্রত্যেক প্রেমিকই জ্যান্ত থাকে। (ফাযা-য়েলে সাদাকাত ২য় খন্ড , ৪৭৬ পৃষ্ঠা)

উক্ত ঘটনাবলীর মত বহু অবান্তর ও আজগুবি কেচ্ছাকাহিনী রয়েছে মাওলানা যাকারিয়্যা রচিত ফাযা-য়েলে আ'আমালের বিভিন্ন ফাযা-য়েল গ্রন্থে।

৫। রাসূলুল্লাহর মাজার থেকে গায়েবী আওয়াজ ঃ মাওলানা যাকারিয়্যা লিখেছেন, হযরত আলী বলেন যে, জানাযা তৈরী করার পর সবচেয়ে আগে আমিই সামনে বাড়লাম। এবং আমি গিয়ে আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল! এই আবূ বাকর, এখানে দাফন হবার জন্য অনুমতি চাচ্ছেন।' তখন আমি দেখলাম, একদমে হুজরার দরজা খুলে গেল এবং একটি আওয়াজ এলো-'বন্ধুকে বন্ধুর কাছে পৌঁছে দাও।' (ফাযায়েলে সাদাকাত, ৯৫০ পৃষ্ঠা) ঐ আওয়াজ কি রাসূলুলাহর, না কার?

কিছু আকীদা সংক্রান্ত বিষয় ঃ

১.'আরাওয়াহে-সালা' গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন, শাহ আবদুর রহীম ভেলায়্যাতী সাহেবের এক মুরীদ ছিল। যার নাম ছিল আবদুল্লাহ্ খান। সে রাজপুত কওমের লোক ছিল। ইনি হযরতের খাস মুরীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার অবস্থা ছিল এই যে, কারো ঘরে যদি (স্ত্রী) গর্ভবতী হতো এবং তাবিজ নেবার জন্য সে আসতো তাহলে তিনি বলে দিতেন যে, তোমার ঘরে ছেলে হবে কিংবা মেয়ে। আর তিনি যা বলে দিতেন তা-ই-হতো। (আরওয়াহে সালা-সাহ্, ১৮৫ পৃষ্ঠার বরাতে ব্রেলভী-দেওবন্দী, ১৯ পৃষ্ঠা)

২.আমার দাদা মাওলানা ইসমাঈল সাহেবের ইন্তেকাল হলে নিযামুদ্দীন থেকে দিল্লী পর্যন্ত সাড়ে তিন মাইল ভিড় লেগে যায়। একজন 'সাহেবে কাশ্ফ' (অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন) বুজর্গ দেখছেন যে, মাওলানা ইসমাঈল সাহেব বলেছেন আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় কর। আমি অতি লজ্জিত। কারণ হুযুর (সাঃ) তাঁর সাহাবাদের সাথে আমার অপেক্ষায় রয়েছে।'

(মাওলানা ইলয়্যাস আওর উন কা দ্বীনি দাওয়াত, ৪৭ ও ৪৮ পৃষ্ঠার ভাবার্থ)

উক্ত দুটি বিষয়ে বিশ্বাস করলে ঈমান ঠিক থাকবে কি?

প্রচলিত তাবলীগ জামাতের (আখতার ইলিয়াছ প্রবর্তিত) কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে মূল সমস্যা সমূহ

প্রথম সমস্যা ঃ

ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তির বা স্তম্ভের তিনটিকে (দ্বীন কায়েমের সুবিধার কথা চিন্তা করে) পরিবর্তন করে অতিরিক্ত চারটি স্তম্ভ যুক্ত করে দ্বীনের মধ্যে আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। যা কি না সম্পূর্ণ নাজায়েয ও সুস্পষ্ট বিদয়াত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্নিত এক ভাষনে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেনঃ জেনে রাখ সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব। আর সর্বোত্তম কর্মবিধান হচ্ছে মুহাম্মদ (সাঃ)এর উপস্থাপিত জীবন-পন্থা। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম জিনিস হচ্ছে নবোদ্ভাবিত মতাদর্শ আর প্রত্যেক নবোদ্ভাবিত মতাদর্শই সুস্পষ্ট গোমরাহী।

(মুসলিম)

যে লোক এমন আমল করল, যার অনুকূলে ও সমর্থনে আমার উপস্থাপিত শরীয়াত নয় (অর্থাৎ যা শরীয়াত মুতাবিক নয়) সে আমল অবশ্য প্রত্যাখ্যান যোগ্য। (মুসলিম)

দ্বিতীয় সমস্যা ঃ

যে অঞ্চলে বা স্থানে শুধুমাত্র আল্লাহর দেয়া শরীয়াহ মুতাবেক দেশ ও জাতি পরিচালিত হয়–তাকে দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র বলে। তাবলীগ জামাতের গত ৭০ বৎসরের কর্মসূচীতে কোনদিনও দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার কোন কর্মসূচী নেই। তাই হিজরত নেই, জিহাদ নেই, আছে শুধু দুনিয়া বিরাগী সন্ন্যাসী বানানোর কর্মসূচী। তাই মুসলিম নামধারী ইসলাম বিরোধী বাতিল অপশক্তি যারা আল্লাহর দেয়া বিধানকে পিছে নিক্ষেপ করে মানুষের তৈরী করা আইন দিয়ে দেশ রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালিত করে তারা আখতার ইলিয়াছ প্রবর্তিত প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতকে খুবই পছন্দ করে এবং নিজেরাও তাবলীগে মাঝে মাঝে তিন দিন সময় লাগায় কিংবা চিলায় যায়। কারন ঐ সমস্ত লোক হিন্দু খ্রীষ্টানদের মত যে বাতিল আকিদায় বিশ্বাসী [অথাৎ দ্বীনদারি অংশের মহাপ্রভু আল্লাহ আর দুনিয়াদারী অংশের মহাপ্রভু মানুষের তৈরিকৃত আইন।] তার বিরুদ্ধে তাবলীগ জামায়ত একটা টু শব্দও করে না। অথচ ইসলাম দ্বীন পরিপূর্ণ। এ দ্বীনের কিছু অংশের উপর আমল করা আর কিছু অংশ বাদ দেয়ার পরিণতি সম্পর্কে কালামে পাকে এরশাদ হচ্ছেঃ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর?" তোমাদের যারাই এরকম করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। (বাকারা ঃ ৮৫)

অথচ প্রচলিত এই তাবলীগ জামাত মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দলিল বিহীন মনগড়া ভ্রান্ত আমলের দিকে শুধু ডাকছে। অথচ ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি মুয়ামালাত সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র ফরজ করা ইবাদত সমূহের বিষয়ে তারা শুধু নীরবই নয় বরং তাদের বক্তব্য দ্বীন পবিত্র বস্তু পক্ষান্তরে রাজনীতি হল নোংরা বিষয়; তাই দ্বীনকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখতে হবে। এ ধরনের চিন্তা, কথা ও কাজ সম্পূর্ণ নাজায়েয। হিন্দু, খৃষ্টান আর বৌদ্ধদের আকীদা হল তারা ভগবান, গডকে মন্দিরে আর গীর্জায় আটকে রাখে এবং বিশেষ বিশেষ দিনে ও সময়ে তাদের কাছে হাজির হয়ে ইবাদতের দায় দায়িত্ব সম্পন্ন করে। আর জীবনের বাদ বাকি অংশ মানুষের তৈরী করা আইনের অধীনে ছেড়ে দেয়। এ রকম বিশ্বাস, কথাও কাজ আল্লাহ্‌র 'তাওহীদ আল হাকিমিয়ার' সাথে সুস্পষ্ট শিরক। এই পুস্তকের আলোচনা থেকে আশা করি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে আমাদের জীবনের দ্বীনদারী এবং দুনিয়াদারি উভয় ক্ষেত্রেরই মহাপ্রভু হলেন আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা। অতএব উনার কিছু আয়াতের উপর আমল করব আর বাদ বাকি হুকুমগুলিকে পাশ কাটিয়ে চলে যাব এবং লোকজনকে সেগুলো থেকে বিরত রাখব এ কাজগুলি নিশ্চিত মুনাফিকী কাজ এবং এর পরিণতি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর।

আল্লাহ তা'য়ালা হুকুম করেছেন

"হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (বাকারা ২০৮)

ইহুদী, খৃষ্টান আর মুশরিকরা তো চায়ই আমরা শুধুমাত্র খাস কিছু ইবাদতে মশগুল থাকি যা কিনা শুধু মসজিদ কেন্দ্রিক ও গাট্টি বোঝা নিয়ে মসজিদে পড়ে থাকি আর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম, জিহাদ, হিজরতের মত ইবাদতসমূহ ত্যাগ করি। তাহলেই দুনিয়ায় রাজত্ব চলবে তাদের (ইহুদী মুশরেক ও তাদের তাবেদার তাগুতদের)। অথচ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ) কে নমরুদ নামক জালেম শাসকের কাছে, মুসা (আঃ) কে ফেরাউনের দরবারে এবং মুহাম্মদ (সাঃ)কে আবু জেহেল, আবু লাহাব নাী জালেম সমাজপতিদের নিকট সরাসরি তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদের) দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

"তিনি প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা অসহ্যকর (অপ্রীতিকর) মনে করে।" (সূরা আত-তাওবা ঃ ৩৩)

রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) যতদিন নিজে চুপচাপ ইবাদত করেছিলেন ততদিন কুরাইশ কাফেররা উনার বিরোধিতা করেনি। কিন্তু যখনই আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হুকুমে মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা

করার আহবান জানিয়েছিলেন আর তখনি মুহাম্মদ (সাঃ) এবং উনার সঙ্গীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। এ ছিল তাওহীদের দাওয়াত যা কুরআনের ভাষায় মুশরিক কাফেররা কখনই পছন্দ করবে না। পরবর্তী বইটিতে (তাগুত ২য় খণ্ড) তাওহীদের বিস্তারিত আলোচনা থেকে ইনশাআল্লাহ আপনাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে প্রচলিত এই তাবলীগ জামাত মানুষকে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক তাওহীদের দিকে আহবান করছে কি? ইসলামে প্রবেশের প্রথম শর্ত তাওহীদের কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। লা করতে হবে ইলাহ দাবীদারদের সাথে, আল্লাহর উপর ঈমান আনার আগে (ইল্লাল্লাহ)। এই ইলাহা দাবীদার তাগুত কারা তা তাদের কাছে কি সুস্পষ্ট? তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তাগুত কি, কে তাগুত এবং কিভাবে তাগুতের সাথে কুফরী বা 'লা' করতে হবে। দেখবেন তাদের অধিকাংশ লোকই উত্তরে কি বলছে। অথচ কুরআনে পাকে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আল-বাকারাহ ২৫৬ আয়াতে শর্ত দিয়ে দিয়েছেন যে, তাগুতকে অস্বীকার করা ছাড়া কেউ মুসলিম হতে পারবে না। যে তাগুতের পরিচয় জানে না সে কিভাবে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং নিশ্চিত সে নানা প্রকার শিরকের মধ্যে পতিত রয়েছে। আর শিরককারী যত আমলই করুক না কেন তার সকল আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ কুরআনে পাকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা রাসূল (সাঃ)কে জানিয়ে দিয়েছেনঃ

"আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি এ অহী নাযিল হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করেন, তাহলে আপনার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।"

(আয-ঝুমার ঃ৬৫)

অতএব মানুষকে তাওহীদের সঠিক জ্ঞান না দিয়ে বেশি বেশি (দলিল ছাড়া) আমল করানো অরণ্যের রোদন ছাড়া কিছুই নয়।

তৃতীয় সমস্যা ঃ

ইসলামে বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে একটি ফরজ হুকুমঃ

" তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৩)

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়ত কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয় তো বা কোন একটা বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ জানেন, তোমরা জাননা।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৬)

যেখানে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা জিহাদকে ফরয (অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া) করে দিলেন মুসলিমীনদের জন্য এবং জানিয়ে দিলেন জিহাদের কল্যাণের বিষয়ে অথচ তাবলিগ জামাত সর্ববস্থায় জিহাদকে অপছন্দ করে এবং জিহাদকে কিভাবে পাশ কাটানো যায় তার জন্য ভ্রান্ত যুক্তি দাড়া করিয়েছে। এটা কি মুনাফিকের নমুনা নয় কি? জিহাদের বিষয়ে তাদের বক্তব্য "বাতি জালালে অন্ধকার আপনিই দূর হয়, অন্ধকারকে পিটিয়ে দূর করার দরকার নেই।" জিহাদের বিরুদ্ধে তাদের এ যুক্তি তাদের ফাযায়েলে আমলের কিছু ঘটনা থেকে বের হয়ে আসে। তাদের এ বক্তব্য দ্বারা মনে হচ্ছে খোদ রাসূল (সাঃ) যেন বুঝতেই পারেননি যে, দাওয়াত দিয়েই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যেত। অযথা উনি নিজে ২৭টি জিহাদে অংশ গ্রহণ করে বোধ হয় মস্ত বড় ভুলই করে ফেলেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। তাই আজ দুনিয়াতে যখন ইহুদী, খ্রীষ্টান আর হিন্দু চক্র মিলে মুসলিম নিধন অভিযান চালিয়েছে সর্বত্র; নির্বিচারে হত্যা করছে মুসলিম নারী, শিশু এবং পুরুষদেরকে। লুণ্ঠিত হচ্ছে মা বোনদের ইজ্জত, জোরদখল করা হচ্ছে মুসলিমদের ভূমি, কোথাও আল্লাহ্র আইন (শরীয়াহ) কায়েম করার চেষ্টা করা হলে আক্রমণ করা হচ্ছে এক যোগে। এমতাবস্থায় প্রচলিত এই তাবলীগ জামাতের আলেম নেতারা এ বিষয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করেন না। নিজেরা যেমন চোখ বন্ধ করে রাখেন তেমনি তাদের অনুসারীদেরকে এ ব্যাপার থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে বলেন। এ থেকে কি এটা প্রমাণিত হয় না এটা ইহুদী চক্রান্ত? মুসলমানদের কাপুরুষ ও জিন্দালাশ বানানোর প্রচেষ্টা। শুধু তাই নয়, জিহাদ ও হিজরতের শরয়ী অর্থ বিকৃত করে গাট্টি বোঝা নিয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার নাম দিয়েছে নফসের সাথে জিহাদ (যাকে তারা বলে জিহাদে আকবর) আর মসজিদে মসজিদে ঘুরাফিরা করাকে নাম দিয়েছে হিজরত। এটা আখতার ইলিয়াছী তাবলিগ জামাতের মুরুব্বীদের মনগড়া জিহাদ ও হিজরতের ব্যাখ্যা।

কুরআন সুন্নাহর দলিল বিহীন তাবলীগ জামাআতের লেখনি চালনায় প্রধান মুবালিগ মাওলানা যাকারিয়া রচিত ফাযা-য়েলে আ'মাল প্রমাণ করে যে, তাঁদের নিকটে বিভিন্ন আমলের ফযীলত জিহাদের চেয়েও বেশী!

ক। তাউস বলেন, বাইতুল্লাহকে দেখা অতি উত্তম সেই ব্যক্তির ইবাদতের চেয়েও যে ব্যক্তি রোযাদার, রাত জাগরণকারী এবং আল্লাহ্র রাহে জিহাদকারী হয় (ফাযায়েলে হাজ্জ ৭৭ পৃষ্ঠা)। এই বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কাবা শরীফকে নিছক দেখাটাই জিহাদের চেয়ে বেশি ফযীলতময়। কুরআন ও হাদীস থেকে এ দাবীর প্রমাণে কোন দলীল আছে কি?

খ। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হুযুর (সাঃ) কে শুধালেন, কেউ কি শহীদ না হয়েও শহীদের সাথী হতে পারে? হুযুর (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি দিনরাতে বিশবার মরণকে স্মরণ করে সে হতে পারে (মাওত কী য়্যা-দ ১৩ পৃষ্ঠার বরাতে তাবলীগ জামাআত ১৫৫ পৃষ্ঠা)। এই বরাতহীন হাদীসটি প্রমাণ করে যে, কেবল মরণের বিশবার স্মরণ জিহাদের সমতুল্য। এটা জাল হাদীস।

চতুর্থ সমস্যা ঃ

চেল্লা ফারসী শব্দ। যার শাব্দিক অর্থ চল্লিশ। সূফী ও পীরদের ভাষায় চেল্লা বলা হয় কোন একটি বিশেষ জায়গায় অবস্থান করে কিছু বিশেষ আমল চল্লিশ দিন ভরে অভ্যাস করা। মুহাম্মদ ইলিয়াস ঐ চেল্লাকেই সুকৌশলেই তার তাবলীগী মিশনে লাগিয়েছেন। তবে তিনি তার চেল্লায় একটু তারতম্য ঘটিয়েছেন। তা হল এই যে, তাদের তাবলীগী চেল্লা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কিংবা খানকায় বসে নয়। বরং তা তাবলীগী গাশত (ফারসী ভাষায়) বা ঘোরাফেরায় হবে। তাবলীগী গাশতের সময় এই তাবলীগের লোকেরা কতিপয় নিয়ম আবিষ্কার করেছে। ১। আমীর, ২। রাহবার (পথ প্রদর্শক) ৩। মুতাকাল্লিম (কথা বলনে ওয়ালা) নির্বাচন। এ তিন ব্যক্তি নির্বাচন তাদের মনগড়া কাজ। কারণ কোথাও কোন দল প্রেরণের নেতা একজনকেই নির্বাচন করা রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাত। একই দলের তিন রকমের নেতা নির্বাচন সুন্নাত পরিপন্থি।

তাবলীগ জামাতের লোকেরা বলে দারুল ইসলাম নেই তাই আমরা রাসূলের (সাঃ) মক্কী জীবনের অবস্থায় রয়েছি। তাই শুধু দাওয়াত দিতে হবে। এ জাতীয় মনগড়া কথা, চিন্তা বিদয়াত। কেননা রাসূল (সাঃ) এবং সাহাবারা (রাঃ) মক্কাতে থাকাকালীন সময় আল কুরআন এবং রাসূল (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ শরীয়তের কিছু অংশ তখন নাযিল হয়েছিল, তাই উনাদের শরীয়তের সকল হুকুম-আহকাম (অহি নাজিল সম্পন্ন হয়নি বলে) পালন করতে হয়নি। কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে শরীয়তের সকল হুকুম আহকাম আমাদের সামনে উপস্থিত এবং আমাদের যথাসাধ্য তা পালনের হুকুম রয়েছে।

আল্লাহতায়ালার হুকুম নামায কায়েম কর যখন আমরা পালন করার সিদ্ধান্ত নেই তখন প্রথমে আমরা কোরআন ও সুন্নাহ থেকে রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিয়ে সেই পদ্ধতিরই অনুসরণ করে নামায কায়েমের চেষ্টা করি। কেউ নিজের থেকে কখনই পাচ ওয়াক্ত নামাযকে ৬ বা ৭ ওয়াক্ত বানিয়ে নেইনা কিংবা প্রতি রাকাতে দুইটা সিজদার জায়গায় ৩ বা ৪টা সেজদা দেয়ার নিজস্ব কোন পদ্ধতি বানিয়ে নেই না। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার আল্লাহতায়ালা যখন সেই কোরআনেই বললেন দ্বীন কায়েম কর তখনই প্রত্যেকে কিংবা যে কোন আলেম কিংবা বুজুর্গ লোক নিজে নিজে দ্বীন কায়েমের একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করে নিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করতে লেগে যায়। আর এর থেকেই শুরু হয় দলাদলি বা গ্রুপিং। অথচ আল্লাহতায়ালা বলেছেন,

"তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে অনৈক্য (দলাদলি) সৃষ্টি করো না। (আশ শুরা :১৩)

রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের পর কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র (দারুল ইসলাম) থাকাকালীন কিংবা দারুল ইসলাম না থাকলে দ্বীন কিভাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে হবে এ ব্যাপারে কুরআন আর সুন্নাতে সুস্পষ্ট দলিল উপস্থিত।

আল হারিস আল-আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাকে যে পাঁচটি কাজ সম্পাদনের আদেশ দিয়েছেন আমি তোমাদেরকে সেই পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি। (১) আল-জামায়াহ, (২) শ্রবণ, (৩) মেনে চলা, (৪) হিজরাহ ও (৫) জিহাদ । কেননা যে ব্যক্তিই আল-জামায়াহ ত্যাগ করে সে তার গলা থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলে। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) নবী (সাঃ), এমন কি সে যদি রোজা রাখে ও নামাজ পড়ে তবুও? নবী জবাব দিলেন, 'এমনকি সে যদি রোজা রাখে ও নামাজ পড়ে তবুও । আরেক বর্ণনায় বলা হয়েছে, ' এমনকি সে যদি মুসলিম হওয়ার দাবি করে! আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা বলে ডেকেছেন তাকে যদি তাই বলে ডাক আল-মুসলিমীন, আল-মুমিনীন, আলা্র বান্দা্" । (আহমদ)

হাদীসে রাসূল (সাঃ) থেকে উনার হুকুম মোতাবেক সমস্ত মুসলিমরা আল জামায়াহর খলিফাকে বাইয়াত দিতে হবে। যে কেউ কুরআন সুন্নাহ থেকে কিছু আয়াত ও হাদীসে রাসূল নিয়ে দল বানিয়ে দাওয়াতী কাজ শুরু করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও বিদয়াত। সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ এবং তাফসীর ইবনে কাসীর মোতাবেক এ খলিফা বা আমীরুল মুমিনীনকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট মন্ডিত হতে হবে। যথা পুরুষ লোক হওয়া, আযাদ হওয়া, বালিগ হওয়া, বিবেক সম্পন্ন হওয়া, মুসলমান হওয়া, সুবিচারক হওয়া, ধর্মশাস্ত্রে সুপন্ডিত হওয়া, চক্ষু বিশিষ্ট হওয়া, সুস্থ ও সঠিক অঙ্গ বিশিষ্ট হওয়া, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া, সাধারণ অভিমত সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া এবং কুরায়েশী হওয়া ওয়াজিব।

[তাফসীর ইবনে কাসীর ১ম খন্ড পৃঃ ২২২]

সমস্ত মুসলিমকে এ আমিরুল মুমিনীন এর কাছে দারুল ইসলাম থাকাকালীন সময়ে এবং না থাকলেও (দুর্বল অবস্থায়) বাইয়াত দিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে লেগে থাকতে হবে। কারন অন্য সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে খলিফাকে বাইয়াত ছাড়া মৃত্যু জাহিলীয়াতের মৃত্যু ঃ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি আল্লাহর রাসূল (সাঃ)কে বলতে শুনেছেনঃ "যে ব্যক্তিই খলিফাহর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে, সে কোন প্রকার অব্যাহতি ছাড়াই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। যে ব্যক্তি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি (বাইয়াহ) ছাড়াই মৃত্যুবরণ করে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে।" (মুসলিম)

উক্ত হাদীসে কোথাও দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) না থাকলে সমস্ত মুসলিম একজন খলিফার নেতৃত্বে থাকতে পারবে না এই রকম কোন শর্ত দেওয়া হয়নি। বরং কুরআন আর সুন্নাহ থেকে সুস্পষ্ট যে কখনও মুসলিমদের তাফাররুক বা দলাদলি করা যাবে না। কোন ইসলামী নাম দিয়ে দল বানানো

হারাম। যেমন মুহাম্মদ আখতার ইলিয়াস তাবলীগ জামায়াত বানিয়েছেন। মুহাম্মদ আখতার ইলিয়াস কি আমিরুল মুমিনীন ছিলেন? সহীহ হাদীস মুতাবেক তাঁর আমিরুল মুমিনীন হওয়ার যোগ্যতা নেই। তিনি তার জামায়াতকে আল জামায়াহ কোথাও বলেননি। তার বানানো তাবলীগ জামায়াত কুরআন হাদীসের দলিল মুতাবেক আল জামায়াহ নয় অতএব এটা একটা ফেরকা।

এ গ্রন্থের প্রথম দিকে উল্লেখিত হাদীসদ্বয় থেকে জানতে পারি রাসূল (সাঃ) এর পর খলিফারা আসবেন কিংবা দুনিয়াতে কোন খলিফা না থাকলে হাদীস মোতাবেক খলিফার বৈশিষ্ট্য পূরণ করে (যা উপরে তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে বর্ণিত হল) এমন একজনকে বাইয়াত দানের মাধ্যমে খলিফা নিযুক্ত করতে হবে। একই সময়ে একের অধিক অর্থাৎ দুইজন খলিফাকে বাইয়াত দেয়া হলে প্রথম দেখতে হবে কোন খলিফা হক এবং তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। দুইজন খলিফাই যদি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে যেই খলিফাকে প্রথমে বাইয়াত দেয়া হয়েছে উনি থাকবেন এবং প্রয়োজনহলে (যদি দ্বিতীয় জন প্রথমজনকে বাইয়াত দিতে অস্বীকার করে) দ্বিতীয় খলিফাকে হত্যা করতে হবে যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

আবু সা'ঈদুল খুদরী কর্তৃক বর্ণিত যে নবী (সাঃ) বলেছেন "যদি দুজন খলিফাহ আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি (বাইয়াহ) নেন তবে তাদের শেষোক্ত জনকে হত্যা কর।" (মুসলিম কিতাবুল ইমারাহ)

একজন মুসলিমকে হত্যা করা শিরকের পর সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ। অথচ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য এত বেশি জরুরী যার জন্য প্রয়োজনে একজন মুসলিমকে হত্যা করা জায়েজ করা হয়েছে। অতএব মুসলিম উম্মাহকে দলা-দলি করে ভাগ করা যাবে না। এবং আমাদের কাজ খলিফাকে বাইয়াত দিয়ে আল জামায়াহর সাথে লেগে থাকা।

আল জামায়াহর খলিফার দায়িত্ব কুরআন সুন্নাহ মুতাবেক আমাদেরকে পরিচালিত করা। কিভাবে দাওয়াত দিতে হবে, ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলে কিভাবে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠর চেষ্টা করা যায়, কখন হিজরত করতে হবে, কিভাবে মুসলিমদের একত্রিত করা যায়, কিভাবে নামায কায়েমও যাকাত আদায় করা যায়, কিভাবে মুসলিমদের বিবাদপূর্ণ বিষয় কুরআন সুন্নাহ দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা যায়। কিভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের কাজের বাধা দেয়া যায়, কিভাবে নির্যাতিত উম্মাহকে রক্ষা করার জন্য জিহাদ করা যায় ইত্যাদি সবই আল-জামায়াহর খলিফার ইখতিয়ার ভুক্ত বিষয়। উনি সিদ্ধান্ত নিবেন আর আমাদেরকে তার হুকুম মত চলা ওয়াজিব ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না উনি কোন শিরক কিংবা কুফর হুকুম দিবেন। তাই এ দাওয়াতী কাজেও খলিফার সেই পন্থাই গ্রহণ করতে হবে যা কি না আল্লাহ্ তায়ালা রাসূল (সাঃ) কে দিয়েছেন।

আল-কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাবলীগের ক্ষেত্র পর্যায়ক্রমে তিন রকম হবে। যেমনঃ আল্লাহ্ তাঁর নবীকে বলেনঃ**"আর তুমি তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়দেরকে ভয় দেখাও"** (শুআরা ঃ ২১৪) এই আয়াত প্রমাণ করে যে, তাবলীগের প্রথম ক্ষেত্র হবে নিজের ঘরবাড়ীও পাড়া-পড়শী।

দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ **আর (এই কুরআন দ্বারা) তুমি ভয় দেখাতে পার উম্মুল কুরা (মক্কা) বাসীদেরকে এবং ওর আশেপাশের লোকদেরকে** (আনআম ঃ ৯২)। এই আয়াত প্রমাণ করে যে, নিজের ঘরবাড়ী ও পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে আল্লাহ্র ও জাহান্নামের ভয় দেখানোর পর ঐ পরিধি একটু বাড়িয়ে শহর ও শহরতলীতে বিস্তৃত হবে।

তৃতীয় পর্যায় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ **"তুমি বলে দাও, হে মানব সমাজ! আমি তোমাদের সবারই কাছে আল্লাহ্র দূত।"**
এই আয়াত প্রমাণ করে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাবলীগের কাজ শেষ হলে তবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে হবে। তবে এই তৃতীয় হুকুমটি রাসূলের নায়েবদের দায়িত্ব, অর্থাৎ খলিফা তার অধীনস্থ কুরআন সুন্নাহর ইলমধারী আলেমদের নিয়ে কয়েকটি দাওয়াতী দল বানাবেন এবং উনারা খলিফার দূত হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বা রাষ্ট্রে তাবলীগ করতে যাবেন। যেমনটি রাসূল (সাঃ) মদিনায় পাঠিয়েছিলেন বিশিষ্ট সাহাবা মুসায়েব (রাঃ) কে। এটা সর্ব সাধারণের কাজ নয়। সাধারণ জনগণকে আল্লাহ্ বলেনঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও" (সূরা তাহরীম ৬ষ্ট আয়াত)।

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক ঈমানদারই নিজেকে এবং তার পরিবারবর্গকে দ্বীনে ইসলামের তাবলীগ করবে।

উবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ "তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমরা প্রত্যেকেই নিজের রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তাই যে ব্যক্তি লোকদের নেতা সেও রাখাল। তাকে তার রাখালীর জওয়াবদিহী করতে হবে। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবারবর্গের রাখাল। তাকে তার পরিবারের রাখালীর জওয়াবদিহী করতে হবে। আর প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের ও তার সন্তানদের রাখাল। তাকে ওদের সম্পর্কে জওয়াবদিহী করতে হবে। আর কোন ব্যক্তির ক্রীতদাস তার মনিবের মালের রাখাল। তাকে ওর সম্পর্কে জওয়াবদিহী করতে হবে। তাই সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (বুখারী, মুসলিম)।

অতএব মুসলিম নামধারী প্রত্যেককেই দ্বীনে ইসলাম কি, তা জানতে হবে এবং নিজের ঘরবাড়ীতে তা প্রচার করতে হবে। তাকে প্রচলিত আখতার ইলিয়াছ প্রবর্তিত তাবলীগ জামাতের লোকদের মত নিজের ঘরবাড়ী ছেড়ে দেশ বিদেশে তাবলীগ করতে যেতে হবে না। কারণ, উপরে বর্ণিত সহীহ হাদীসটি প্রমাণ করে

যে, আমিরুল মুমিনীন বা খলিফা ও উনার নিয়োগকৃত আমীররা ও দাওয়াতী দলের আলেমরা ছাড়া সাধারণ জনগণকে তার অধীনস্থ ঘরবাড়ীর লোক ব্যতীত অন্যের জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে না। তাই যাঁরা নিজ নিজ ঘরে এবং নিজ গ্রাম কিংবা নিজ শহরে তাবলীগ না করে বরং চিল্লার নামে অন্য শহরে কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে ফাযায়েলে আমলের জ্ঞান নিয়ে তাবলীগ করতে যাচ্ছেন, তাঁরা দ্বীনে ইসলামের মুহাম্মদী তাবলীগী পালন করছেন কি? চিল্লা দেয়া সংক্রান্ত কুরআন সুন্নাহর কোন দলীল নেই। বরং সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে নিম্নে হাদীস পাই ঃ

আবু সুলায়মান মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কয়েকজন নবী (সঃ)-এর কাছে হাযির হলাম। আমরা ছিলাম সমবয়স্ক যুবক। আমরা একাধারে বিশ রাত তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। তিনি অনুভব করলেন, আমরা আমাদের পরিবারে ফিরে যেতে আগ্রহী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, আমরা বাড়িতে কাকে কাকে রেখে এসেছি। আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বাস্তবিকই অত্যন্ত সদয় এবং দয়াশীল ছিলেন। তিনি বলেনঃ তোমরা নিজেদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাও, তাদের দীনের জ্ঞান দান করো এবং ভালো কাজ করার নির্দেশ দাও। আর তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো ঠিক সেভাবে নামায পড়ো। নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের নামাযে ইমামতি করবে।" (বুখারী,মুসলিম,দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)।

উক্ত হাদীসটি প্রমাণ করে ধরা বাধা নির্দিষ্ট করে চল্লিশ দিনের জন্য রাসূল (সাঃ) উনার সাহাবাদেরকে কখনই নিজের কাছে রেখে তালিম দেননি। কিংবা কোন দাওয়াতী দলকে চল্লিশ দিনের চিল্লা দিয়ে (অর্থাৎ চল্লিশ দিন অবস্থান করতেই হবে) দাওয়াত দিতে কোথাও পাঠিয়েছেন এরকম কোন দলীল নেই। সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন উনারা কেউ কোন দিনও চিল্লা দেননি কিংবা চিল্লা দেওয়ার কোন হুকুম দিয়েছেন বলে কোন দলীল নেই। এটা আখতার ইলিয়াসের তৈরী করা বিদয়াত।

অতএব দেখা যাচ্ছে এ তাবলীগ জামাত চিল্লা দেয়ার নামে মুসলিমদেরকে পরোক্ষভাবে দুনিয়া বিরাগী সন্ন্যাসী বানাচ্ছে। শরীয়ত মানুষকে কখনো বলে না দুনিয়াকে বর্জন কর, উপবাস ও ঘর বাড়ী সংসার পরিবার ছেড়ে অপরিচিতদের মাঝে দিনের পর দিন অতিবাহিত কর, আত্মার দাবী, শরীরের দাবী অস্বীকার করে নিজেকে কষ্ট সাধনায় নিক্ষেপ করে জীবনের সকল স্বাচ্ছন্দ সকল ঘুমকে নিজের জন্য হারাম করে দাও। একবার চিন্তা করে দেখুন ঐ সকল মা বোনদের কি অবস্থা যাদের স্বামীরা কিছুদিন পরপর চিল্লার নামে ঘর ছেড়ে বহুদিনের জন্য চলে যাচ্ছেন। স্ত্রীর হক, পিতামাতার হক, সন্তানের হক আদায় করা আল্লাহর বিধান থাকা সত্ত্বেও আপনারা কি আখতার ইলিয়াসের ও বুজুর্গ মুরুব্বিদের মন গড়া ইবাদত পদ্ধতির দিকে অন্ধভাবে ছুটছেন। বৎসর চিল্লা, জীবন চিল্লার নামে খ্রীষ্টানদের পাদ্রী, নান এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদের মত বৈরাগ্য বাদকে হালাল করা

হচ্ছে কি এ তাবলীগ জামাতের কর্মপদ্ধতিতে। অথচ হজ্জ্ হিজরত ও জিহাদ ছাড়া ঘর বাড়ি পরিবার ছেড়ে এভাবে মাসের পর মাসের জন্য বের হয়ে যাওয়ার বিধান আল্লাহতায়ালা দেননি। তাও হিজরতের সময় পরিবারকে সাথে নিয়ে হিজরত করা হয়। এমন কি জিহাদের ব্যাপারেও খলিফাদের নেয়া পদক্ষেপ লক্ষণীয়। যেমন ওমর ইবনুল খাত্তাব মুসলিমদের কোন বাহিনীকে জিহাদের জন্য যখন কোথাও পাঠাতেন, ছয় মাসের অধিক কাউকে বাহিনীতে রাখতেন না। নতুন লোকদের পাঠিয়ে সেই মুসলিমদের তাদের পরিবারে ফেরৎ আনাতেন। আল্লাহ্ আমাদের হক এবং বাতিল বুঝবার তাওফীক দিন; আমীন।

পঞ্চম সমস্যা ঃ

এজতেমার নামে তিন দিনের যে জমায়াতের আয়োজন করা হচ্ছে তা আর একটি বড় বিদয়াত। ইহুদী কোম্পানী বাটার দেয়া ময়দানে প্রতিবছর যে জামায়াতের আয়োজন করা হচ্ছে এবং দেশ বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক আসছে তা কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক সম্পূর্ণ অবৈধ।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন– "তিনটি মসজিদ ব্যতীত (ইবাদত বা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে) কোথাও সফর করা যাবে না। (মসজিদ তিনটি হল) মসজিদে হারাম, (কাবা ঘর) মসজিদে নববী ও মসজিদে আকছা।" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ,)

হজ্জ-ই হচ্ছে ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি। প্রতি বছর মুসলমানদের শুধু হজ্জের জন্য মক্কা, মদীনায় সমবেত হওয়ার অনুমতি রয়েছে। হজ্জ ব্যতিত দুনিয়ার অন্য কোন স্থানে প্রতিবছর নিদিষ্ট করে একত্রিত হওয়া বা এস্তেমার জমায়েতের আয়োজন করা বিদয়াত। এর দ্বারা মুসলিমদের মনে হজ্জের বিকল্প চিন্তা শুরু হয়ে যায়। গরীব মুসলিমরা বর্তমানে বলা শুরু করে দিয়েছে যে- 'হজ্জে তো আর যেতে পারছি না তাই এস্তেমার যাচ্ছি; হজ্জের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ ইত্যাদি। অথচ সামর্থ্য না থাকলে যেমন যাকাত দিতে হয় না তেমনি হজ্জ করারও দরকার নেই। এটাই আল্লাহর হুকুম অর্থাৎ ইবাদত। এ সকল কথা কাজ ও চিন্তা ইসলামের বিরুদ্ধে কত বড় গর্হিত কাজ তা ভাষায় প্রকাশের অবকাশ রাখে না। ইহুদী, খৃষ্টান আর হিন্দু চক্রের দাপটে আর চক্রান্তে আজ দুনিয়ার বুকে দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) নেই, যেখানে আল্লাহ্র আইন বা শরীয়াহ কার্যকর থাকবে একজন খলিফার নেতৃত্বে। আজ আমরা নামায কায়েম ও যাকাত আদায় রাষ্ট্রীয়ভাবে করতে পারছি না। সওমের পবিত্রতা রক্ষা করাও কঠিন। ঠিক সেই সময়েই এ নাস্তিক্যবাদী চক্র চাচ্ছে আমাদের ইসলামের আরেকটা স্তম্ভ হজ্জ থেকে মুসলিমদের নজর অন্য দিকে ফিরাবার। তাই তারা মদদ ও সাহায্য দিচ্ছে ও উৎসাহিত করছে বিশ্ব ইজতেমা নামক নতুন বিদয়াতকে। যেন মুসলিমদের হজ্জের থেকে চোখ ফিরানো যায়। আল্লাহ আমাদের এ সকল ইসলাম ধ্বংসকারী বিদয়াত থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

হে আল্লাহ্ ইসলাম দ্বারা আমাদেরকে দন্ডায়মান অবস্থায় হেফাজত করুন, ইসলাম দ্বারা আমাদের বসা আবস্থায় হেফাজত করুন, ইসলাম দ্বারা আমাদেরকে রুকু অবস্থায় এবং সেজদারত আবস্থায় হেফাজত করুন।

واخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين –